هكَذَا فَلْنَقْرَأ

(أصولٌ هامَّةٌ ونماذجُ تطبيقيةٌ للدراسة الفعَّالةِ)

এভাবে পড়ুন

(ফলপ্রসূ অধ্যয়নের কিছু নীতি ও নমুনা)

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তফা

هكَذَا فَلْنَقْرَأ

(أصولٌ هامَّةٌ وأمثلةٌ تطبيقيةٌ للدراسة الفعَّالةِ)

এভাবে পড়ুন

(ফলপ্রসূ অধ্যয়নের কিছু নীতি ও নমুনা)

يقول الشيخ العلامة المربي المحقق مولانا محمد عوامة

حفظه الله تعالى ورعاه، وأطال بقاءه وأدام نفعه:

العلمُ: هو الحفظ والفهم، والعملُ والتطبيقُ، والتخلق والتعبد، والتصوُّنُ والتحقق، والمحاسبة للنفس والمراقبة لله، والاهتداءُ بهَدْيِ سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، والاقتداءُ بسيرة أصحابه وتابعيهم بإحسانٍ.

(«معالم إرشادية» ص٢٠)

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তফা

এভাবে পড়ুন
(ফলপ্রসূ অধ্যয়নের কিছু নীতি ও নমুনা)

লেখক	আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তফা
স্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	রবীউল আউয়াল ১৪৪৩ হিজরী
প্রকাশক	দারুল ইমাম আল-আ'যম
ব্যবস্থাপনা	মাদরাসাতুন নূর আল-ইসলামিয়্যা
যোগাযোগ	০১৯৩১৬১১০১০
প্রকাশিত গ্রন্থ	০১
মূল্য	২৪০ টাকা মাত্র

আল-
ইহদা

হযরাতুল উসতায

মাওলানা মুফতী ইমদাদুল হক ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম-এর দস্ত মুবারকে।

ফরিদাবাদ জামিয়ায় মিশকাত পড়ার সময়
ফাতহুল ক্বদীর-এর কয়েক পৃষ্ঠা হযরতকে
শুনিয়েছিলাম। বহু পরে হলেও বাস্তব সত্য
হল, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম (যদি
কিছুটা বুঝে থাকি)— কিভাবে কিতাব
পড়তে হয়? কিতাব বোঝার আসল
হাকীকতটা কী?

দোয়া করি— আল্লাহ হযরাতুল উসতাযকে
সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন এবং
আমাদেরকে হযরত থেকে যথাযথ উপকৃত
হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর; আমাদের মহান রবের, যার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। ইলমী খেদমত তো পৃথিবীর সেরা কর্ম। তা কিভাবে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত ও বরকত ছাড়া সম্ভব হতে পারে? তাই সকল প্রশংসা ও শোকর আপনার হে আল্লাহ! আমাদের যা কিছু তা সত্যিই আপনার হে আল্লাহ! আপনিই দান করেন। আপনিই রহম করেন। সবকিছু আপনিই ব্যবস্থা করেন। হৃদয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনা আপনিই তৈরী করেন। তাই সকল প্রশংসা আপনার হে আল্লাহ, সকল শোকর আপনার।

হাজার সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি। যিনি ইসলাম-বৃক্ষকে আমাদের জন্য রোপন করতে শুধু শরীরের ঘাম নয়; ঢেলেছেন তাজা খুনও পরম মমতা ও ভালবাসায়। যার স্নেহ ও শফকত না হলে মানবজাতি বহু আগেই হারিয়ে যেতো অন্ধকারের অতল গহ্বরে। হাজার কষ্ট ও যাতনা সয়ে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন এমন মহান এক কিতাব, যা সমূহ অন্ধকারের মাঝে আমাদেরকে দান করে নির্মল কোমল আলো। যে আলোতে একজন মুসলিম পেয়ে যেতে পারে পথের দিশা। রেখে গেছেন তাঁর সুন্নাহ, যার আরামদায়ক ছায়ায় বসে মুমিন দেখতে পায় জীবন-পথের সকল নিশান। পৌঁছে যায় মানযিলে মাকছূদে। তাই হে আল্লাহ, হাজার হাজার সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আপনার পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মাদ-এর প্রতি।

অগণিত ছাহাবা-তাবেয়ীন থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত ইসলামকে যারা প্রচার করেছেন এবং ইসলামকে যারা হেফাযত করেছেন– তাদের সবার প্রতি বর্ষিত হোক রহমতের বারিধারা। কত ঘাম আর রক্ত তাঁরা ঝরিয়েছেন শত খণ্ডেও তা শুমার করা সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি– হে ইসলামের মহান খাদিমান, হে সকল যুগের আবূ বকর ও ওমরেরা, হে আমর ইবনুল 'আছ ও মু'আবিয়ারা, হে খালিদ ও আবূ 'উবায়দারা, হে মুজাহিদ ও মুকাতিলেরা, হে আবূ হানীফা ও মালিকেরা, হে জুনাইদ
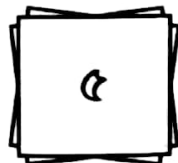
ও জীলানীরা, হে বুখারী ও মুসলিমেরা, হে জুরজানী ও যামাখশারীরা, হে সীবাওয়াইহ ও মুবাররিদেরা, হে খলীল ও সা'লাবেরা, হে ইউসুফ বিন তাশফীন ও ইউসুফ আউয়ুবীরা, হে নিযামুল মুলক ও কাযীয়ে ফাযেলেরা, হে... হে... সালাম আপনাদের সবাইকে। আপনাদের রব বর্ষণ করুন আপনাদের প্রতি রহমত ও রিযওয়ান। আমাদেরকেও দান করুন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণের সম্মান।

প্রিয় তালিবে ইলম ভাই আমার, এটি ছোট্ট রিসালা। এর ৩৫ পৃষ্ঠার মতো লেখা নেয়া হয়েছে আমাদের অপর গ্রন্থ ***কিছু ইলমী আদব*** থেকে। আর বাকী প্রায় ৮০ পৃষ্ঠার অধিক লেখা হয়েছে সপ্তাহ দু'একের মধ্যে।[১] আরও কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুযোগ না থাকায় আপাতত এখানেই কলমকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি চান এবং আপন দয়ায় তাওফীক দান করেন, বারবার সম্পাদনা ও সংযোজন-বিয়োজন করে রিসালাটি সুন্দর করার ইচ্ছা রইল।

এ বিষয়ে লেখার জন্য অবশ্যই যুগ-যুগ পড়াশোনা করা জরুরী। লেখক ইলমের প্রাথমিক তালিবে ইলম হওয়া সত্ত্বেও আশা করি বইটি আমার ভাইদের পড়ালেখায় বিশেষ উপকারে আসবে ইনশা-আল্লাহ।

বারবারই অনুভব হচ্ছে– রিসালাটি প্রকাশ করে মূলত নিজেরই মূর্খতা প্রচার করতে যাচ্ছি কি না?! বিশেষত ভয় লাগছে এ জন্য যে, বহু পূর্ব থেকেই তাছনীফ-তালীফ আমাদের সমাজে 'মৌলিক' উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। অথচ ইলম তলব ও তাহকীকই আমাদের একমাত্র মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া জরুরী ছিল। আমাদের অঙ্গীকার হবে– আমরা আজীবন পূর্ণ মুহাব্বত ও জযবার সঙ্গে ইলমের তলব ও তাহকীকে মশগুল থাকবো। এর পর প্রয়োজন অনুসারে কলম ধরবো।[২] চিন্তায় গলদ থাকায় লেখাতেও মারাত্মক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমীন।

আমাদের উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী ইমদাদুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম। হযরতের বরকতেই আল্লাহ সামান্য হলেও কিতাব বোঝার তাওফীক দান করেছেন, যদি কিছু বুঝে এসে থাকে। এ কিতাবও হযরতেরই বরকতের ফসল। আমার মতো বহু তালিবে ইলম ভাই হযরতের কাছে দু'এক পৃষ্ঠা শুনিয়ে 'বুঝ' কী, তা অনুভব করতে পেরেছেন। জামিয়া রাহমানিয়া, জামিয়াতুল উলূম ইসলামিয়্যা, জামিয়াতু ইবরাহীমসহ অনেক মাদরাসার তালিবে ইলম ভাইয়েরা হুযূরের কাছে

---

১ আর যা বৃদ্ধি পেয়েছে বারবার সম্পাদনার পর বৃদ্ধি পেয়েছে।

২ পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন– লেখার অনুশীলন ও লেখা শেখা থেকে পাঠককে বিরত রাখা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে লিখতে হলে প্রথমে পড়তে হবে। ইতকান ও তাহকীকের সঙ্গেই পড়তে হবে। লেখা আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমরা পেশার জন্য লেখি এবং তাহকীক ছাড়া ভাসাভাসা লেখি।

আসতো; ***ফাতহুল ক্বদীর*** ও ***ফাতহুল বারী*** থেকে কিছু শোনানোর জন্য। যারা হযরতের কাছে একবারও কোনো 'ইবারত শুনিয়েছেন তাদের অভিব্যক্তি এমন–

আমরা আগে মনে করতাম, অধ্যয়ন মানে– শান্ত নদীতে চলন্ত নৌকার মতো তরতর করে এগিয়ে চলা। হুযূরকে পড়া শোনাতে এসেও আমরা তা-ই শুরু করেছিলাম। কিন্তু 'আনা আখিযুন বিহুজাযিকুম'-এর দরদে তিনি আমাদের কটিদেশ ধরে ফেললেন। একটু একটু করে গভীরে নিয়ে চললেন; পরম মমতায়, অসামান্য দরদ-ভালোবাসায়। 'বিছিগারিল ইলমি কবলা কিবারিহী' যেন বাঙময় হয়ে উঠলো আমাদের হুযূরের মুখের মধুর হাসিতে, মুক্তোতুল্য প্রতিটি বাক্যের ভাঁজে ভাঁজে।

বললেন, চলুন। আমরা আবারও তরতর করে চলতে গেলাম। তিনিও আবার ধরলেন আমাদের কটিতে। মৃদু আঘাত করলেন আমাদের চেতনার পিঠে। তবে তাঁর চেহারায় নেই বিরক্তির সামান্যও ছাপ, বরং দরদের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চেহারা-আকাশের কোষে-কোষে। সে দরদ আমাদেরও কিছুটা স্পর্শ করেছিল। সে দীপ্তি আমাদের অন্ধকার কুঠুরিকে কিছুটা হলেও আলো দান করেছিল। এভাবে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণ দেয়ালেন ডুবুরি হতে। হাতে-কলমে বোঝালেন– পড়তে হয় ডুবুরির মতো। সাতারুর মতো নয়। তবেই অর্জন করা যায় ইলম-সাগরের অতলদেশে লুকিয়ে থাকা মণিমুক্তোর ভাণ্ডার।

আল্লাহ তা'আলার কাছে খাস দোয়া, আল্লাহ যেন হযরাতুল উসতাযকে পূর্ণ সুস্থতার সঙ্গে হায়াতে তায়্যিবা তবীলা দান করেন। উঁচু উঁচু ইলমী খেদমতগুলো করিয়ে নেন। হযরতের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও শাগরেদ-তালামেযা সবাইকে সর্বদা নেক ও কল্যাণের বারিধারায় সিক্ত রাখেন। তাদের ব্যাপারে হযরতের তামান্না পূর্ণ করেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

হযরাতুল উসতাযের প্রতি শোকরগুযার হয়ে দু'একটি বাক্য লেখা জরুরী মনে হয়েছে, তাই লেখা হল। হুযূরের যুহদ ও তাকওয়ার বিষয়ে যদি 'সামান্য কিছুও' জানা না থাকতো, হয়ত আরও বেশ কিছু এখানে লেখা হতো। কিন্তু দুনিয়াবিমুখ আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ আলেমগণ এসবে অসন্তুষ্ট হোন। সে ভয়েই বিরত থাকা হল। লেখকের খুবই ইচ্ছা ছিল– হযরতের নযরে ছানীর পরই এ কিতাব প্রকাশ করা। কিন্তু হযরত সম্পর্কে দু'একটি কথা ও ইহদার কারণে সে সাহস করতে পারি নি।

এবার কিতাবটি সম্পর্কে কিছু কথা :

- এই রিসালায় গ্রন্থ অধ্যয়নের কিছু উসূল ও যাওয়াবিত উল্লেখ করার পাশাপাশি সেগুলোর তাতবীকের প্রতিও বিশেষ নযর রাখা হয়েছে।

তাতবীকের ক্ষেত্রে ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমুল ফিকহ ও ইলমুল লুগাতের আলোচনাই এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেহেতু এখানে ফন্নী আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়, তাই অনেক ক্ষেত্রেই আলোচ্য উসূল ও নীতিমালার প্রায়োগিক প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

- কিতাবটির শুরুতে কিছু ইলমী আদাব আলোচিত হয়েছে। এটা শুধু বরকতস্বরূপ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার খাস ফযল ও করমে এ বিষয়ে ***কিছু ইলমী আদব*** কিতাবে অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে।

- কিতাবটির দ্বিতীয় অংশ ফাহমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তৃতীয় অংশ ফলপ্রসূ অধ্যয়নের কিছু নীতিমালা সম্বলিত। পাঠককেই এগুলো পার্থক্য করে বুঝে নিতে হবে। এ জন্য আলাদা কোনো অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করা হয় নি।

- কিতাবে উল্লেখিত নুসূস মুরাজা'আত করলে দেখা যাবে– কখনো কখনো শব্দ ও মর্ম ঠিক রেখে প্রয়োজন অনুপাতে নসকে সংক্ষেপন করা হয়েছে। তাই পূর্ণ তাফাক্কুহের জন্য নুসূস মুরাজা'আত করা একান্ত জরুরী। এতে আশা করা যায়– ইখতিসার ও তালখীসের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার হবে ইনশা-আল্লাহ।

- কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নীতি ও নমুনা যথাসম্ভব যথেষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। লেখার মতো আরও শিরোনাম ছিল। ইচ্ছা আছে– ভিন্ন শিরোনামে এ বিষয়ে আরও কিছু কাজ করা। আল্লাহ তাওফীক দান করুন এবং কবূল করুন। আমীন।

- কিতাবে কখনো কোনো তাসামুহের উপর সংক্ষেপে তাম্বীহ করা হয়েছে। এর পর কোনো কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সকল স্থানে উদ্দেশ্য এটা নয় যে, উক্ত কিতাবে সঠিক বিষয়টি নির্ণয় করা হয়েছে, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কিতাবে বিভ্রাট ঘটেছে সে কিতাবেরই হাওয়ালা দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কারণে সেটা সুস্পষ্ট বলা হয় নি।

- কিতাবটির বিষয়বস্তু এমন, আমরা মনে করি– কলমের কালিতে এর পূর্ণ চিত্রায়ন সম্ভব নয়। বরং এ কিতাবটিও যথাযথ বুঝতে হলে উসতাদের সহায়তা প্রয়োজন। তাই কিতাবের নীতি ও নমুনা থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার জন্য প্রাজ্ঞ কোনো উস্তাদের সোহবত জরুরী।

- স্পষ্টই যে, কিতাবের প্রতিটি নির্দেশনা প্রত্যেক তালিবে ইলম ভাইয়ের জন্য নয়। অনেকেই আছেন, স্বভাবজাত যোগ্যতার কারণে এসব বাঁধা নিয়ম-নীতি থেকে অনেক উর্ধ্বে। তাই নীতিগুলো নিজের আমলে নিতে হলে খু-ব সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। অন্যথায় কারো ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ– কিতাবে অভিধান অধ্যয়নের কথা বলা হয়েছে। কেউ যদি ভাষার পরিপক্ব যোগ্যতা ছাড়া অভিধান অধ্যয়ন করতে যায়, উপকারের চেয়ে তার ক্ষতিই বেশি হবে।

- কিতাবটি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে সম্পাদনার কয়েকটি মারহালা অতিক্রম করেছে। কোনো কোনো মারহালা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। কিতাবটি তিনবার সম্পাদনা করার পর দু'সপ্তাহের অধিক সময় ধরে কিতাবটির দরস অনুষ্ঠিত হয়েছে। দরসে আমাদের লাজনার কয়েকজন সাথী শরীক ছিল। কিতাবের ভাষা, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ মুনাকাশা করে করে গ্রন্থটি পড়া হয়েছে। অত্যন্ত নির্মমভাবে বারবার সম্পাদনার ছুরি চালানো হয়েছে। সাথীদের যৌক্তিক যেকোনো নকদ মেনে নেয়া হয়েছে। যেখানে উভয়টিই সহীহ সেখানেও কোনো পাঠক তারজীহ করলে অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের তারজীহ অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে।

  এরপর চারজন হুশমন্দ সাথী অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পুরো কিতাব সম্পাদনা করেছেন। লেখকও এর মাঝে আবার দু'বার সম্পাদনা করেছে। এরপর অপর চারজন সঙ্গী আরও নিশ্ছিদ্র মনোযোগের সঙ্গে আবার সম্পাদনা করেছে। তারপর সবার সম্পাদনার পর লেখক আরেকবার সম্পাদনা করেছে। পাঠকের সামনে ওই সম্পাদিত কপিই পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কিতাবটি সুন্দর করার জন্য, বিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে কিছু মেহনত করা হয়েছে। তাই আশা করি, ভুলগুলো পাঠকবর্গ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

- কিতাবটির ভাষার ক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় হল– ভাষাকে সাবলীল ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা হয়েছে। পড়তে গিয়ে যেন খসখসে মনে না হয়, সেটাই লক্ষ্য করা হয়েছে। তারপরও লেখক তাঁর লেখার ভাষা-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতই দিকপাল কয়েকজন আলিম সাহিত্যিকের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। উদ্দেশ্য– সুন্দরভাবে মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়ে তোলা। সাহিত্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হওয়া নয়।

যে কোনো রচনাকে ত্রুটিমুক্ত করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। যেমন ইমাম শাফেয়ী (মৃত ২০৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,

أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحًا غيرُ كتابه[৩]

এ কিতাবের বেলায়ও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই কিতাবকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার লক্ষ্যে সালাফের নীতি অনুসারে কিতাবকে প্রথমে পড়ানো হয়েছে। তারপরও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে আমাদের আরয– যদি কোনো ভুল আপনাদের নযরে আসে আমাদেরকে জানাবেন। আমরাও কিতাবটি বারবার নযরে ছানী করে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

কিতাবটি রচনার পর থেকে এর সম্পাদনা ও প্রকাশনা পর্যন্ত অনেকের ইহসান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এত অধিক মানুষের ইহসান এখানে যুক্ত হয়েছে, যা লেখকেরও ঠিক জানা নেই। তাই ব্যাপক শোকরিয়ার পর বিশেষভাবে শোকর করছি মুহাম্মদবাগে অবস্থিত উম্মুল ক্বোরা মাদরাসার প্রাক্তন মুদীর হযরত মাওলানা নাজমুল হুদা ছাহেবের, যেখানে থাকা অবস্থায় এ কিতাবের খসড়া তৈরী হয়েছিল। ভুলে যাচ্ছি না মুদীর ছাহেবের অন্যান্য সঙ্গীদেরও। আল্লাহ তাদের মাদরাসাকে কবূল করুন এবং তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

প্রিয় শাগরেদ আবদুল্লাহ ঢাকুবী সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভুল ধরিয়ে দিয়েছে। প্রিয় ভাই মুহাম্মাদ মুশার্‌রফ অতি সূক্ষ্ম কিছু ভুল শুদ্ধ করে দিয়েছে। ভুলগুলো সত্যিই সাদা কাপড়ে কালো দাগের মতো। সাঈদ, উসমান, নাজমুস সাকিব, মাহবূব, তানজীল ও ইসহাক আরও অনেক অসৌন্দর্য ও ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছে। প্রকাশনায় অস্বাভাবিক দরদ ও মুহাব্বতের সঙ্গে বিরাট সহায়তা করেছে আবূ উসামা আলী আহমাদ ও ইমরান হুসাইন। এরা সবাই এত বেশি সহায়তা ও মুহাব্বত দেখিয়েছে, মনে হচ্ছে– কিতাবটি আমার রচনা নয়; বরং তাদের প্রত্যেকের নিজের! সঙ্গীদের পক্ষ থেকে এতটা সহায়তা পাওয়া আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নেয়ামতই বটে। কারণ, এ ছাড়া এ কিতাব না সুন্দর করা যেতো, আর না প্রকাশের চিন্তা করা যেতো। আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

এই মুহূর্তে আমার আবদুল্লাহ, খাদীজা ও উম্মে আবদ সবাই আমার থেকে অনেক দূরে অসুস্থ; জরাক্রান্ত। তাদের ধৈর্য ও উৎসাহ না হলে ঠিক সময়ে কিতাবটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখুন এবং কবূল করুন। আমীন।

---

৩ ***কাশফুল আসরার*** ১/১৯ (ভূমিকা অংশ)।
কেউ কেউ ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এই বক্তব্যকে শুধু কিতাবাতের ভুলের অর্থে ধরেছেন। সকল ভুলই এখানে উদ্দেশ্য। কিতাবাতের ভুল থেকে বাঁচা সহজ। অন্যান্য ভুল থেকে বাঁচা অনেক কঠিন। ***যফারুল আমানী***-এর তাহকীকের ভূমিকা।

সবশেষে আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, ইয়া আল্লাহ! বস্তুর এ দুনিয়ায় আমাদেরকে বস্তুবাদী চিন্তা থেকে হেফাযত করুন। বেশি পাঠক ও প্রচার দেখে আমরা ধোঁকায় পড়ে যাই। হে আল্লাহ, আমার ভাইদের হৃদয়ে যেন আমার এ ভাঙ্গা কলমের কালি ঝড় তোলে। আমার ভাইদের চেতনার জগতে যেন এ ক্ষীণ আওয়াজ 'আছ-ছলাতু খায়রুম মিনান নাউম'-এর সূর তোলে। তাদের জীবন-তরী যেন পৌঁছে যায় মানযিলে মাকছূদে; পূর্ণ নিরাপদে। আমার ভাইয়েরা যেন পেয়ে যায় আপনাকে, আপনার কিতাবকে এবং আপনার নবীকে, তাঁর সুন্নাহকে। আপনি যদি ভাঙ্গা হৃদয়ের এ কামনাটুকু কবূল করেন, তবেই এ লেখা সার্থক। অন্যথায় দুনিয়ায় আমার মেহনত বৃথা। আখেরাতও শূন্য। ইয়া আল্লাহ, আপনি মাফ করুন, আপনি কবূল করুন। আমাদের এই সামান্য মেহনত না হোক অরণ্যে রোধন- এই আমাদের কামনা। আমীন। ছুম্মা আমীন।

মুহাম্মাদ মুস্তফা আবূ আবদুল্লাহ

১০ই রজব ১৪৪২ হিজরী

উম্মুল ক্বোরা মাদরাসা, মুহাম্মাদবাগ, ঢাকা

এরপর

মাদরাসাতুন নূর আল-ইসলামিয়্যা, ডেমরা, ঢাকা

২৪ই সফর ১৪৪৩ হিজরী

সূচি

❁❁❁

হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী (মৃত ১৪৪১ হি.) তাঁর ***আপ ফতওয়া ক্যায়সে দ্যাঁ*** কিতাবে নকল করেছেন– হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান গীলানী (মৃত ১৩৯৬ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হাওলা মুরাজা'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে বললে ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করলো, হযরত, হাওয়ালা যদি হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মত সতর্কবান কোনো ব্যক্তি দেন? হযরত গীলানী ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি রসিকতা করে বললেন, 'শুধু ইবনে হাজার (পাথরের পুত্র) নয়, ইবনে জাবাল (পাহাড়ের পুত্র)ও যদি কোনো হাওয়ালা দেন তাও মুরাজা'আত করতে হবে।'

***

এ তো হলো কেউ কোনো কিতাবের হাওলা দিলে মুরাজা'আতের কথা। কখনো এ রকম হয় যে, কোনো লেখক বলেন, 'আমার জানা মতে[১৫৯] এ বিষয়টি এই এই কিতাবে নেই।' কিন্তু তালাশ করে দেখা যায়– বিষয়টি আসলে অমুক কিতাবে আছে।

আরবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এমন একটি ঘটনা ঘটে। শিক্ষার জন্য তিনি নিজেই সে ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وقد وقعَ مِنِّي مرةً أني نفيتُ في كتابٍ من كتبي «الرفعُ والتكميل» (ص ٢٠٦ ت الطبعة الثالثة) بعد المراجعة والرجوعِ للفهارس المرشدةِ: وجودَ حديثٍ في «صحيح مسلم»، وقد عزاه إليه الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، فدَلَّني

নকল করেছেন তাঁর ***তানকীহুত তাহকীক*** গ্রন্থ থেকে। বাস্তবে সেটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য। বিস্তারিত দেখুন লেখকের অপর গ্রন্থ ***ইলমী মতানৈক্যে আমাদের করণীয়*** (ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য)।

১৫৯ শধু 'নেই' বলার চেয়ে 'আমার জানা মতে' বা এ ধরণের তা'বীর করাই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (মৃত ২০৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি বক্তব্য লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন,

ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصَّةِ: أَجْمَع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيتِ خبر الواحد، والانتهاءِ إليه، بأنه لم يُعلمْ من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثَبَّتَه= جاز لي ذلك، ولكنِّي أقول: **لم أحفظْ عن فقهاء المسلمين أنّهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد.** انتهى من كتاب «اليقينيُّ والظنّي من الأخبار» (ص١٠٣) للشيخ المحقق الدكتور الشريف حاتِم بن عارف العوني، نقلاً عن «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال صاحبي سعيد: هو من «الرسالة» ص٤٩١-٤٩٢ من طبعة دار الحديث.

بسم الله الرحمن الرحيم

সর্বদা অযু অবস্থায় অধ্যয়ন করুন

প্রিয় ভাই আমার, আপনি যদি ইলমে বরকত চান, সর্বদা ওযু অবস্থায় কিতাব অধ্যয়নের চেষ্টা করুন। ইলমের নূর আর অযুর নূর মিলে 'নূরুন আলা নূর' হয়ে যাবে। বাংলায় যাকে বলে 'সোনায় সোহাগা'। একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেখুন, অযুর সঙ্গে অধ্যয়ন করলে দিলটা কত ভালো লাগে! অযু ছাড়া শুধু বসে থাকলেও যেন কেমন কেমন লাগে।

আমাদের মহান পূর্বসূরিদের অনেকেই এমন আছেন যারা কখনো অযু ছাড়া কিতাব স্পর্শ করতেন না। আমাদের মাযহাবের একজন মহান ইমাম শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী[৪] (মৃত ৪৪৮ হি. কিংবা তার পরে) রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি কখনো অযু ছাড়া কোনো কাগজও স্পর্শ করেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন,

إِنَّما نِلْتُ هذا العلم بالتعظيم؛ فإني ما أخذتُ الكاغدَ إلا بالطهارة.

'ইলমকে সম্মান করার বরকতেই আমি এই ইলম পেয়েছি। ইলমের সম্মানে কখনো ওযু ছাড়া কোনো কাগজের টুকরাও স্পর্শ করি নি।'[৫]

আহা, কী দূরবস্থা আমাদের! পারলে আমরা কুরআন মাজীদও ওযু ছাড়া ধরে ফেলি! আহা, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী আমরা পড়ছি,

---

৪ হযরতের এই নিসবত মিষ্টান্ন (আরবীতে 'হাল্ওয়া') বিক্রির দিকে লক্ষ্য করে। 'হাল্ওয়ান' শব্দটি 'হালওয়া'-এর একটি মাছদার হিসেবে হালওয়ানীও বলা যাবে। তবে আরবীতে লিখতে 'হালওয়াঈ' লেখাই উত্তম। কারণ, 'হুলওয়ান' নামে আরবীতে এক শহর রয়েছে। হরকত না থাকায় ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বাংলাতে সমস্যা নেই বিধায় এবং হালওয়ানী উচ্চারণ তুলনামূলক সহজ হওয়ায় বাংলাতে আমরা 'হালওয়ানী'ই লিখেছি। *মুকাদ্দিমাতু 'উমদাতুর রি'য়ায়া*, মাওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনবী (মৃত ১৩০৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৫ ইমাম বুরহানুদ্দীন যারনূজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *তা'লীমুল মুতা'আল্লিম ত্বরীকাত-তা'আল্লুম* পৃ. ৩৯-৪০ (ইলম ও আহলে ইলমের সম্মানের অধ্যায়)।

শুনছি এবং নিজ হাতে ধরছি, অথচ আমাদের অযু নেই!![৬] বাহ্যিক পবিত্রতাই যদি রক্ষা করা না যায় তাহলে ভিতরগত পবিত্রতা..? সেটা তো আরো কঠিন। আহা, কত যুলুম করছি আমরা নিজেদের প্রতি! ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (মৃত ৪৮০ হিজরীর পর) রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক রাতে ইলমী গবেষণায় ডুবে ছিলেন। অসুস্থতার দরুন বারবার ইস্তেঞ্জার জরুরত হল। মাত্র এক রাতে সতেরবার ইস্তেঞ্জা করতে হল! এক রাতে এতবার!! কত কষ্ট হয়েছিল তাঁর! আহা, কত কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি!

আশ্চর্যের বিষয় হলো– তিনি সতেরবার ইস্তেঞ্জার পরই অযু করে ইলমী গবেষণায় মগ্ন হয়েছেন। আহা, সে যুগের ইস্তেঞ্জাখানা না জানি কত দূর ছিল! আরো কত দূর থেকে জানি পানি এনে ইস্তেঞ্জায় যেতে হত!! আহা, কত কষ্ট না জানি হয়েছে এই মহান ইমামের! এ তো একদিনের একরাতের কষ্টের ইতিহাস। জানি না, সারাজীবন ইলমের জন্য কত কষ্ট তিনি করেছেন! এত কষ্টের ফলেই আজ আমরা তাঁর কলম থেকে পেয়েছি *উসূলুস সারাখসী* নামক বিরাট ইলমী কারনামা। পেয়েছি *শারহুস সিয়ারিল কাবীর* নামে তিন খণ্ডে ছাপা দীর্ঘ এক গবেষণা-গ্রন্থ। আরো পেয়েছি মোটা মোটা পনের খণ্ডে ছাপা *আল-মাবসূত* নামে ফিক্বহ শাস্ত্রের এক উত্তাল দরিয়া, হাজার বছর ধরে যার ঊর্মিমালা আছড়ে পড়ছে প্রতেক হানাফী ফকীহের হৃদয়-তীরে।

ইয়া আল্লাহ, আপনি তাঁকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আরো বর্ষণ করুন রহম ও করমের বারিধারা এই উম্মতের সকল ইমাম ও দ্বীনের সকল খাদিমের প্রতি। অবগাহন করান আপনি তাঁদেরকে আপনার রহমতের দরিয়ায়। আপনার দয়া ও অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নিন তাঁদের সবাইকে। আমাদেরও তাওফীক দান করুন তাঁদের পিছনে থাকার, তাঁদের মত ও পথ অবলম্বন করে দুনিয়াতে দ্বীনের খেদমত করার। আমীন।

হযরত বুরহানুদ্দীন যারনুজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *তা'লীমুল মুতা'আল্লিম* গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে–

والشيخُ الإمام شمسُ الأئمة السَّرَخْسِيُّ رحمه الله تعالى كان مبطُونًا، وكان يُكَرِّرُ في ليلةٍ، فتوضأَ في تلك الليلة سبع عشرة مرةً؛ لأنه كان لا يكرِّرُ إلا بالطهارة.

---

৬ একটি নমুনা দেখুন– **প্রিয় লেখক প্রিয় বই** পৃ. ৯৫-৯৬

وهذا؛ لأنَّ العلم نورٌ، والوضوءَ نورٌ، فيزدادُ نورُ العلم.

অনেকের প্রশ্ন থাকে, এ তো দূর অতীতের উদাহরণ। আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব তাঁদের মতো হওয়া। তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য বেশি ছিলো। আমাদের তা নেই।

এসব ওযর প্রতিষ্ঠানে চলতে পারে। কিন্তু ইলমের কাছে তা একেবারেই নিরর্থক। ইলম এ সকল ওযর গ্রহণ করে না। সালাফ ও খালাফের বড় পার্থক্য হলো হিম্মত ও উচ্চ মনোবলে। ইতিহাস পড়ে দেখুন, তাঁদের উপায়-উপকরণে কত স্বল্পতা ছিলো! আর আমাদের উপায়-উপকরণের কোনো শেষ নেই। আসলে যে কাজের প্রতি যার দরদ ও ব্যথা থাকবে, আল্লাহ তাকে দিয়ে সে কাজ করিয়েই নিবেন। এটাই যমীনে আল্লাহর নেযাম। এটাই ইতিহাসের সাক্ষী।

এবার নিকট অতীতের একটি উদাহরণও দেখে নিন। ইমামুল আছর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (জন্ম ১২৯২ হি. মৃত ১৩৫২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি জগদ্বিখ্যাত একজন আলিম ও ইমাম ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের ব্যপ্তি ও গভীরতার কাছে মহাসাগরও যেন ছোট্ট একটি পাত্র সদৃশ। বড় আলিম হিসেবে তাঁকে সবাই চেনে। কিন্তু তিনি কিভাবে এত বড় হয়েছেন– এর রহস্য অনেকেরই অজানা। সেই রহস্য হযরত নিজেই প্রকাশ করেছেন এভাবে–

میں نے سات سال کی عمر کے بعد دین کی کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور مطالعہ کے دوران کبھی کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا۔ اگر کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور حاشیہ دوسری جانب ہے تو ایسی کبھی نوبت نہیں آئی کہ حاشیہ کی جانب کو گھما کر اپنے سامنے کر لیا، بلکہ اٹھکر اس جانب جا بیٹھا ہوں جدھر حاشیہ ہوتا۔

'আমি সাত বছর বয়স থেকে দ্বীনী কোনো কিতাব ওযু ছাড়া মোটেও স্পর্শ করি নি। কিতাবকে নিজের অনুগামী করে আমি মুতালা'আ করি না। বরং আমি নিজেই কিতাবের অনুগামী হয়ে অধ্যয়ন করি। কিতাবের হাশিয়া যদি আমার বিপরীত দিকে হয়, তাহলে আমি নিজ স্থান থেকে উঠে গিয়ে হাশিয়া মুতালা'আ করি। কিতাবকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে মুতালা'আর ঘটনা কখনোই ঘটে নি।'[৭]

৭ ইমামুল আছর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনীর উপর তাঁর ছাহেবযাদা মাওলানা আনযার শাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত ১৪২৯ হি.) লিখিত এক অসামান্য

আগের যুগে পাখা ছিল না। বিদ্যুতের এত সুন্দর বাতি ছিল না। ছিলো প্রচণ্ড গরম আর গাঢ় অন্ধকার। এত গরম আর অন্ধকারে তাঁরা এত অধিক শান্তি ও আলো পেলেন। আমরা কেন আরাম ও আলোতে এত অশান্তি ও আঁধারে ডুবে আছি? পার্থক্য তাহলে কিসের? শুধু দরদ-ব্যথা ও হিম্মত-মনোবলের। এ ছাড়া অন্য কিছুই না। আপনিও চিন্তা করে দেখুন।

আমরা আজ একশ' টাকা দিয়ে এক-দেড়শ' পৃষ্ঠার একটি কিতাব পেয়ে যাই। কিন্তু তাঁদের যুগে এটা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক তালিবে ইলম উস্তাদের কাছে পড়ার সময় নিজ হাতে কিতাব লিখে নিতো। এভাবে পড়েই একজন তালিবে ইলম ফকীহ হতো। যুগের সুব্যবস্থার কারণে তো কিছু সময়ও আমরা বাঁচাতে পারি। আমরা কী সেটা করছি? না সময়ের প্রতি, জীবনের প্রতি এবং নিজের অস্তিত্বের প্রতি দিব্বি গাফলত ও উদাসীনতা 'প্রদর্শন' করে চলেছি?! এটা কীভাবে বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? এত কিছুর পরও আমার কেন এত অধঃপতন?

উত্তর একটাই। বড়দের পথে চলার, বড়দের মতো হওয়ার হিম্মত নেই। আফসোস, শত আফসোস, আমাদের আছে শুধু কয়েক 'পোটলা' ওযর-আপত্তি। অথচ দুনিয়াবী প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও আমরা এসব ওযরকে সঠিক মনে করি না। তাহলে কেন দ্বীনের ব্যাপারে এত অবহেলা?! বেশি বেশি ওযর পেশ করতে থাকা প্রকৃত মুমিনের গুণ নয়।[৮]

আমি যদি সারা জীবন অযুর সঙ্গে কিতাব অধ্যয়নের সাহস করতে না পারি, আপাতত দশদিনের তো হিম্মত করা যায়। আমি হিম্মত করে দেখি কতটুকু পারা যায়? দশদিন পারলে বিশদিনের হিম্মত করবো। এভাবে এগুতে থাকবো। কিছু পরীক্ষা তো অবশ্যই আসবে। আপনি যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোন, আল্লাহ অচিরেই আপনার জন্য এ কঠিন কাজও সহজ এবং একেবারে সহজ বানিয়ে দিবেন। দুনিয়াতে বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার এটা অমোঘ বিধান। আপনিও আল্লাহর রহমত-দুয়ারে কড়া নেড়ে দেখুন না!

মনে রাখবেন, খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন, গাঢ় অন্ধকারের এই পৃথিবীতে যিনিই আলো ছড়ান এবং নর্দমা অপেক্ষা দুর্গন্ধযুক্ত মানব-বাগানকে যিনিই তার সৌরভে সুরভিত করে তোলেন, তিনি বাঁধার শত প্রাচীর ডিঙ্গিয়েই এত কিছু করেন। বাঁধার মহাসাগর সাতরে পারি দিয়েই তিনি সামনে অগ্রসর হোন। হিম্মত আর

গ্রন্থ *নকশে দাওয়াম* পৃ. ৯৩। আরও দেখা যেতে পারে ১০৮ নং পৃষ্ঠা। এ বরকতপূর্ণ গ্রন্থটির অধ্যয়ন থেকে কোনো তালিবে ইলম ভাইয়ের বঞ্চিত থাকা উচিত নয়।

৮ হযরত আলী মিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *মুখতারাত* ১/৬০ (أخلاق المؤمن) শিরোনামে হাসান বসরী (মৃত ১১০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য দেখুন)।

মুজাহাদা কাকে বলে– বুঝলেন কি? কোনো বড় ব্যক্তির ইতিহাসে এ কথা পাবেন না– বিরাট কোনো বাঁধা ডিঙ্গানো ছাড়া তিনি এমনিতেই বড় হয়ে গেছেন। 'বড় হওয়া' আসমান থেকে নেমে আসে না। বরং আসমানওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক করে হিম্মতের সহিত আগাতে থাকলে একজন মানুষ নিজেই বড় হয়ে উঠে।

এ অধ্যায়ের শেষে নিকট অতীত ও বর্তমানের দু'জন মহান আলিমের ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে। একজন আমাদের মহান উস্তাদ। তিনি হযরত মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ (আদীব হুযুর) দামাত বারাকাতুহুম। আরেকজন আমাদের নিকট অতীতের একজন বড় আলেম। তিনি হলেন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী ছাহেব (মৃত ১৪০২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি। উপমহাদেশের উলামা-মাশায়েখের কাফেলার অনন্য এক অভিযাত্রী।

হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর দাওরার সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'ঐ সময় আমার এক সাথী ছিলো। তার নাম হাসান আহমদ। সাহারানপুরের খালাপার তার বাড়ি। বড় নেক তালিবে ইলম। আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খুব আশেক ছিলো। ওয়ালিদ ছাহেবের প্রতি তার ভালোবাসার সীমা ছিল না। আব্বাজানের কাছে দাওরা পড়ার সময় আমি ও মাওলানা হাসান আহমদ দু'টি বিষয়ের খুব ইহতেমাম করতাম।

এক. কোনো হাদীস যেন উস্তাদের কাছে পড়া না ছুটে।
দুই. কোনো হাদীস যেন ওযু ছাড়া পড়া না হয়।

পাঁচ-ছয় ঘন্টা একাধারে সবক হওয়ায় কখনো ওযুর জরুরত হয়ে যেতো। এটাও মাসে-দু'মাসে এক-দু'বার হতো। ঐ সময় সুস্থ ছিলাম। সারা বছরই যোহরের ওযু দিয়ে ইশার নামায পড়তাম। তারপরও যদি আমাদের একজনের ওযুর প্রয়োজন হতো, আরেকজনকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে অযুর জন্য চলে যেতো। এটা ছিল অযু ছুটে যাওয়ার আলামত। তো তখনই অপরজন আব্বাজানকে কোনো ইশকাল করে বসতো, যাতে আরেক সাথীর হাদীস ছুটে না যায়।

আল্লাহ হাসান আহমদ ছাহেবকে খুবই উচ্চ মর্যাদা দান করুন।[৯] তিনি একবার এভাবে উঠে গেলেন। তিনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বে-ফিকির একটা

---

৯ হযরত শাইখুল হাদীস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উসলূব একটু লক্ষ্য করুন। বড়রা সব ক্ষেত্রেই বড়ত্বের পরিচয় দেন। বড়দের সোহবতে থাকলে দৈনন্দিন এমন কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আদবের বিষয়ে তাঁরা

প্রশ্ন করে বসলাম। আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাতে হেঁসে দিলেন। তিনি প্রথম দিনই বুঝে ফেলেছিলেন আমাদের দু'জনের চুক্তির কথা। খুব খুশিও হয়েছিলেন। এরপর থেকে আমাদের কেউ ওঠলেই আব্বাজান একটি ঘটনা শুনাতেন।

আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আদত ছিল সবকে অনেক ঘটনা বলতেন, আর আমার হযরত সাহারানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিলকুলই ঘটনা বলতেন না। আমি উভয়ের কাছেই হাদীস পড়েছি। তাই বছরের শুরুতে আব্বাজানের অনুসরণ করি, আর বছরের শেষে আমার হযরতের অনুসরণ করি।'[১০]

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম *বাইতুল্লাহর মুসাফির* সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

'এ সফরনামার নূরানিয়াত ও তাছীরের একটি বাতেনী কারণ এই যে, এর পূর্ণ 'মুসাওয়াদা' অযুর হালতে মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় সমাপ্ত হয়েছে। বিষয়টি যেহেতু আমার জানা ছিল তাই তা উল্লেখ করে দিলাম, যেন ইলমী কাজে আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।'[১১]

তাম্বীহ করেন– কে তার হিসাব রাখে? যারা সোহবত ও কিতাব; এ দুইকে একসঙ্গে জমা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তারা জানে, কিতাব কখনো সোহবত থেকে বেনিয়ায ও অমুখাপেক্ষী করতে পারে না।

১০ *আপবীতী* ১/৮৫
এখানেও হযরত শাইখুল হাদীস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আদব লক্ষ্য করুন। কী চমৎকার! তারপরও তিনি নিজেকে *আপবীতী*র বিভিন্ন স্থানে 'গোস্তাখ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন!!

১১ *বাইতুল্লাহর মুসাফির* পৃ. ১৯
বাইতুল্লাহর একজন মুসাফির কেমন হবে এবং মদীনার একজন আশেক কেমন হবে– হাতে-কলমে উঠে এসেছে এ বইয়ের পাতায় পাতায়; বরং বাক্যে বাক্যে। এই বই এতটা রূহানিয়্যাত ও নূরানিয়্যাতপূর্ণ যে, নির্দ্বিধায় একে তাসাওউফের কিতাবের মধ্যে শামিল করা যাবে! এ বই পড়লে অতি শুষ্ক হৃদয়েও দীদারে বাইতুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনার ইশকের জোয়ার এসে যায়। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-ঊর্মির মতো ইশক ও ভালোবাসার পাহাড়সম ঢেউয়েরা মধুর গর্জন করতে থাকে। হৃদয়-জগতে ভিন্ন এক সুর ঝঙ্কার বাজতে থাকে। যেন পাঠক এখন ভিন্ন জগতের বাসিন্দা!

লেখকের জন্য দোয়া করুন

মুহসিনের প্রতি শোকরগোযার হওয়া প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। ইসলাম তো বলে, 'যে মানুষের শোকর আদায় করে না সে আল্লাহর প্রতিও শোকরগোযার হয় না।'[১২] মুহসিনের শোকর যে সমাজ থেকে বিদায় নেয়, সে সমাজে বহু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, ইসলাম আদেশ না করলেও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হতো, মুহসিনের প্রতি শোকরগোযার থাকা।

তাই হে প্রিয় ভাই, আপনি যে লেখকের কিতাব পড়বেন তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকুন। পারলে অন্তত দু'রাকাত নামাজ পড়ে লেখকের জন্য দোয়া করুন। তেলাওয়াত করার সময় একবার হলেও লেখকের ঈসালে সাওয়াবের নিয়ত করে নিন।

অনেক পাঠক মনে করেন, লেখা তো খুব সহজ কাজ। কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলন করলে বোঝা যায়, সুন্দর ও গবেষণামূলক কিছু লেখা অনেক কঠিন। হাজার-হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করতে হয়। দিনকে দিন, রাতকে রাত চিন্তা-ফিকির করতে হয়। এ কথা যখন থেকে বুঝে এসেছে তখন থেকেই লেখকদের জন্য সব সময় দোয়া করার চেষ্টা করি এবং এতে অনেক বরকত অনুভব হয়, আল-হামদুলিল্লাহ। আপনিও আমল করে দেখুন, অনে-ক উপকৃত হবেন ইনশা-আল্লাহ। বিশেষ করে যখন যে লেখকের কিতাব পড়া শুরু করবেন, তখন তাঁর জন্য দোয়া করুন এবং তাঁকে আপনার উস্তাদের মত সম্মান করুন। কখনো তাঁর ব্যাপারে আদবের খেলাফ কিছু বলবেন না।

আপনার পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়; মানে ও পরিমাণে। ঠিক সব লেখকও এক স্তরের নন। কারো লেখায় সাহিত্য-সৌন্দর্য পাওয়া যাবে। আবার কারো লেখায় আপনি তা পাবেন না। কারো লেখা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন লেখক দীর্ঘ গবেষণা করে এ কিতাব লিখেছেন। আবার কারো লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে– লেখাটাতে বেশ তাড়াহুড়া হয়ে গেছে। কারো লেখায় উপস্থাপিত তথ্যে ভুল কম। কারো বেশি। এ-সব বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আপনার কর্তব্য, প্রত্যেক লেখককে মুহাব্বত ও সম্মান করা।

---

১২ ***আল-জামে***, ইমাম তিরমিযী (মৃত ২৭৯ হি.) ২/১৭ (হাদীস নং ১৯৫৫) মুহসিনের প্রতি শোকরের অধ্যায়।

আপনি এভাবে চিন্তা করুন, আহা! আমার প্রিয় লেখক এই কিতাব লিখতে গিয়ে কত কষ্ট তিনি করেছেন! আমার সামনে এই ইলমী দস্তরখান পেশ করার জন্যই ছিল তাঁর সকল কষ্ট-সাধনা! জানি না, কত রাত জেগেছিলেন তিনি এ কিতাব লিখতে গিয়ে! জানি না, কত অর্থ খরচ হয়েছে তাঁর এ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে! তিনি যখন আমার জন্য এ কিতাব লিখেছেন, তাঁর শরীরটা কি ভালো ছিল? না তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েই আমার মুহাব্বতে, আমার ভালোবাসায় বহু কষ্ট সহ্য করে এ কিতাব তিনি লিখে গেছেন! তিনি যখন এ কিতাব লিখেছেন তাঁর হৃদয়ের কী হালত ছিল! কেমন মওজ পয়দা হয়েছিল তাঁর দিলে! কত দিকের কত খরচ বাদ দিয়ে না জানি তিনি গ্রন্থ সংগ্রহ করে আমার জন্য এ কিতাব লিখেছেন! এ কিতাব যখন তিনি লিখেছেন কত কষ্ট না জানি তিনি করেছেন; মানসিকভাবে, আর্থিকভাবে। আরো কত দিক থেকে কত কষ্ট করেছেন, আল্লাহই ভালো জানেন। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমার প্রিয় এই লেখককে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

আপনি এভাবে ভাবতে শিখুন, দেখবেন একজন লেখকের ব্যথা কিছু হলেও আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি যদি আদর্শ লেখক হন বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন, উপরের ভাবনাগুলো কত সত্য! যাদের লেখার উদ্দেশ্য হয় সময় কাটানো, তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। বাস্তবে তারা লেখকও নয়।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' (মৃত ১৩৯৬ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরামের মহান কাফেলার এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফিকহ-ফাতাওয়ার তাহকীক ও গবেষণায় অনন্য এক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হযরত মুফতী ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। সেই প্রতিভা থেকেই হিন্দুস্তানের যমীনের বিধান তাহকীক করার জন্য হিন্দুস্তানী ইতিহাসের সকল কিতাব তিনি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন। সুদীর্ঘ গবেষণার পর ***ফুতুহুল হিন্দ*** নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যা তাঁর ***ইসলাম কা নেযামে আরাযী***-এর অংশ হিসেবে ছেপেছে। ইতিপূর্বে এমন বিস্তর তাহকীক ও অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে কেউ কলম ধরেন নি। এই তাহকীকের কথা উল্লেখ করে হযরত শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন,

لیکن آنے والوں کے واسطے علم و تحقیق کا یہ مغز نکال کر رکھنے کے لئے حضرت والد صاحب قدس سرہ کس قدر محنت برداشت کی، کتنی راتوں جاگے، کتنی کتابوں کی ورق گردانی کی، اور کن کن مراحل سے گزرے، اس کا اندازہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔

'আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেমন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। কত রাত জেগেছেন। কত হাজার-হাজার পাতা উল্টিয়েছেন। আরও কত ধাপ পেরিয়ে তাহকীকের এ মগজ তিনি পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন, তা যে কোনো পাঠকের পক্ষেই আন্দায করা সম্ভব নয়।'[১৩]

আপনি যখন কোনো লেখকের কিতাব পড়তে বসবেন, এই অনুভূতি নিয়ে বসুন– আপনি সরাসরি হযরতের সবকে বসেছেন। আপনি সামনাসামনি তাঁর সোহবত লাভে ধন্য হচ্ছেন। এই চিন্তা যদি আপনি করতে পারেন, আশা করি, অল্পতে আপনি অনেক দূ-র এগিয়ে যাবেন। ঐ যে আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বলেছেন, 'ইহসান হলো তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো।'[১৪] এই হাদীসে পাক আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়।

আপনি একটু ভেবে দেখুন, আপনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দরসে বসে আছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে সরাসরি নিজ চোখেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন! কী মিষ্টি হাঁসি দিচ্ছেন তিনি আপনাকে কিতাব বোঝাতে গিয়ে! তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে? হযরত ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আখেরাতের কথা মনে করে, কবরের কথা স্মরণ করে কী জারজার হয়ে কাঁদছেন! আপনি সরাসরি দেখছেন এ পাক মানযার ও সুন্দর দৃশ্য! তখন শুচিতা ও পবিত্রতার কী কোমল বায়ু প্রবাহিত হবে আপনার হৃদয়-মনে– আপনি কি ধারণা করতে পারছেন? আসলে হৃদয়ের সেই আবেগ-অনুভূতির চিত্রায়ন কি কোনো কলমের পক্ষে সম্ভব?

ঐ যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে একজন প্রশ্ন করে বললো, আপনার তো থাকার কথা ইসলামী বড় বড় শহরে। কিন্তু আপনি থাকেন খোরাসানে। সেখানে আপনি কাদের সঙ্গে উঠাবসা করেন? হযরত ইবনুল মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'আমি খোরাসানে হযরত ইমাম শু'বা ও হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা-এর সান্নিধ্য লাভ করি।' তাঁরা দু'জন তো ছিলেন ইরাকের। একজন হলেন বসরার, আরেকজন কুফার। এ ঘটনার আগেই

---

১৩ **মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ** পৃ. ৪৭
আদর্শ জীবন ও জীবনী-গ্রন্থ দেখতে চাইলে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। আমাদের জীবনী-গ্রন্থগুলো হোক এ আদর্শ গ্রন্থের প্রতিবিম্ব। তবে রূহানিয়্যাত ও ফানা ফিল্লাহর ক্ষেত্রে ***হযরত হাফেজ্জী হুযূর এবং আমার আব্বাজান*** এখনো অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এ তো হযরত পাহাড়পুরী হুযূর (মৃত ১৪৩৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ উত্থানকালের কয়েক বিন্দুমাত্র। যারা হযরতকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের কাছে এটা মোটেও অতিশয়োক্তি নয়।

১৪ ***আস-সহীহ***, ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হি.) ১/২৭ হাদীস, ০৮ (কিতাবুল ঈমানের প্রথম হাদীস)। ***আল-মুজতাবা***, ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হি.) পৃ ১১১৭-১১১৮ হাদীস, ৪৯৯০ ও ৪৯৯১ (বাবু না'তিল ইসলাম ও বাবু সিফাতিল ঈমানি ওয়াল-ইসলাম)।

হয়তো তাঁদের ওফাত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমি সর্বদা তাঁদের দু'জনের কিতাবাদি অধ্যয়ন করি।[১৫]

أبو داود، قال: قلتُ لابن المبارك: من تجالِس بخراسان؟ قال: أجالس شعبة وسفيان. قال أبو داود: يعني: أنظرُ في كتبهما.

একই বিষয়ে ইমাম ইবনুল মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আরেকটি ঘটনা দেখুন–

عن شقيق بن إبراهيم البلخي قال: قيل لابن المبارك: إذا صليتَ معنا، لِمَ لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين، قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟! قال: أذهب أنظرُ في علمي، فأدرك آثارهم وأعمالهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس![১৬]

এভাবে দূরে থেকেও আপনি চলে যেতে পারেন অনেক কাছে। অনেক পরে এসেও এগিয়ে যেতে পারেন বহু দূর। যে কোনো ইমামের কিতাব যখন পড়বেন, হৃদয়ে যেন তাঁর প্রতি একটা কোমল অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ মুহাব্বত ও সেই অনুভূতিতে আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন; নিজেরই অজান্তে, কল্পনার বাইরে। আল্লাহ আপনাকে

---

১৫ হাফেয আবূ নু'আইম আসফাহানী (মৃত ৪৩০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *হিলইয়াতুল আউলিয়া* ৬/৩৯৯
হিলইয়াতুল আউলিয়া প্রত্যেক আলিমের অধ্যয়নে থাকা একান্ত জরুরী। ইসলাহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বারবার বিভিন্ন মনীষীদের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে। এখান থেকে সবচেয়ে বড় শেখার বিষয় এটাই। লেখক অনেক মনীষীদের জীবনীতে অত্যন্ত দুর্বল ও জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো পরিহার করা উচিত। বিভিন্ন মনীষীদের জীবনীতে ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ব্যাপারে এমন এমন আপত্তিকর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যা সত্যিই দুঃখজনক। কেমন যেন সুযোগ সন্ধানে থাকা হয়– কিভাবে ইমাম ছাহেবের বিরুদ্ধে একটা আপত্তিকর বর্ণনা উল্লেখ করা যায়। জা'ফর ছাদেক, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্যদের জীবনীতে তিনি এ কাজটা করেছেন। বিস্তারিত দেখা যেতে পারে– الإمام الحافظ الحبر البحر أبو نعيم الأصفهاني وموقفه من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمهما الله تعالى ورضي عنهما রিসালায়।
হাদীসের তালিবে ইলমদের জন্য এ গ্রন্থ অত্যন্ত জরুরী। জারহ-তা'দীলের প্রচুর তথ্য উঠে এসেছে কিতাবের পাতায়-পাতায়। গারায়েব ও আফরাদ বিষয়েও তথ্য কম নয়। ইস্তেখরাজ বিষয়ে জানার রয়েছে অনেক কিছু।

১৬ *হিলইয়াতুল আউলিয়া* ৬/৪০০

তাওফীক দান করুন। আমরাও যেন পাই সামান্য হিস্‌সা— এই আমাদের কামনা। আমীন।

'লক্ষ্য নির্ধারণ করে জীবনপরিচালনাকারী ব্যক্তি তীব্র বেগে ছুটে চলা ঐ মুসাফিরের মতো যে প্রতিটি মুহূর্ত নিবিষ্ট থাকে আখেরি মনজিলের দিকে অগ্রসর হতে। পৃথিবীর দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য-লীলা তাকে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করতে সামনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু সে দুচোখ বন্ধ করে পথ চলতে থাকে লক্ষ্যে পৌঁছার প্রত্যাশায়। ছায়াশীতল বিশ্রামস্থান তাকে আরামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সে এসবের মোহে পড়ে পথ ছাড়ে না। অবিরাম চলতে থাকে। বিচিত্র চিন্তা-চাহিদা তার পথ আগলে ধরে, অবরোধ করে, কিন্তু তার গতি দুর্দম। বাধ মানে না। আঁধারিতে মিশে যায় না। সচল পদবিক্ষেপে এগুতে থাকে। বিভিন্ন উত্থান-পতন, স্খলন ও পদস্খলন তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু তাতেও কোন ছেদ পড়ে না তার ইচ্ছায়, তার প্রতিজ্ঞতায়, তার দৃপ্ত পদচারণায়।'

- চেতনার মিষ্টি সকাল পৃ. ১১-১২

প্রাথমিক তালিবে ইলম ভাইয়েরা
আরবী কিতাব এভাবে পড়ুন

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বিধান, সকল কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ে কষ্ট হবে; কম বা বেশি। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হিম্মত ও মেহনতের সঙ্গে এগুতে থাকলে এ কষ্ট পানি হয়ে যায় অল্প সময়েই। তাই যে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বেই এ চেতনা থাকা দরকার– সকল কষ্টকে অম্লানবদনে মেনে নিয়ে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে সদা সচেষ্ট থাকবো। কষ্ট করার প্রেরণা যদি কারো না থাকে, নোসখায় কোনো উপকার হবে না।

বিশুদ্ধভাবে 'ইবারত পড়ার জন্য নিম্নে লিখিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করুন। ইনশা-আল্লাহ, খুব অল্প সময়েই আপনার 'ইবারত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং অতি দ্রুতই 'ইবারত চালু হয়ে যাবে।

- আপনি যখন ইসমের আলোচনা পড়ছেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতি সর্বদা মনে রাখুন। উদাহরণস্বরূপ– মূল হল প্রতিটি শব্দের শেষে রফা' হওয়া। সাধারণত দুই পেশ হওয়া। মহিলাদের নামে এক পেশ হওয়া। অন্য কিছু হতে হলে দলিল থাকতে হবে। মুযাফ হলে, আলিফ-লাম হলে ও গায়রুল মুনসারিফ হলে শব্দের শেষে এক পেশ হবে। তাই আপনি কোনো 'ইবারত পড়লে নিজেকে প্রশ্ন করে করে পড়ুন। কেন শব্দটিতে রফা'/ জর দিলেন?
- যখন ছুলাছী মুজার্‌রদের বিভিন্ন মাছদার পড়া শুরু করেছেন, 'ইবারতের মাঝে ছীগা আসলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখুন :
    - আপনি ছীগাটির 'আইন কালিমায় কেন পেশ দিচ্ছেন? ছীগাটি বাবে নাছারা বা কারুমার তো? সন্দেহ হলে অভিধান দেখে বাবটি নিশ্চিত জেনে নিন।
    - আপনি যখন ছীগাটির অর্থ বলছেন, খেয়াল করুন, ছীগাটি মাযীর তো? আপনি মুযাক্কার বা ওয়াহেদের অর্থ করছেন। ছীগাটি মুয়ান্নাস বা জমার নয় তো? আপনি ছরফের কিতাবে পড়ার আগেই খেয়াল

করুন– মাযী ও মুযারের ছীগার কিছু আলামত রয়েছে। লক্ষ্য করলে কিছু আলামত আপনিই বের করতে পারবেন। হাযের ও গায়েবের ছীগার আলামতগুলোও বুঝে নিন।

- ছুলাছী মাযীদ ফীহ-এর মাসদার যখন পড়বেন, প্রতিটি বাবের প্রথম মাসদারের ছীগাগুলো খু-ব ভালোভাবে আয়ত্ব করে নিন। এরপর যত স্থানে এই বাবের মাসদার আসছে, প্রথমটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, আপনার ছীগার উচ্চারণ ঠিক আছে তো?

>

- যে কোনো 'ইবারত পড়লে একটি অর্থ বুঝে আসে। অর্থ বোঝার পর লক্ষ্য করুন, অর্থ অনুযায়ী আপনি 'ইরাব দিয়েছেন, না কোথাও ভুল হয়েছে? একটি উদাহরণ দেখুন,

قرأ راشد في المدرسة كتابا عربيّا.

আপনি এর অর্থ বুঝেছেন, 'রাশেদ মাদরাসায় একটি আরবী কিতাব পড়েছে।' তাহলে পড়ার ফায়েল হল রাশেদ। তাই راشدٌ শব্দে অবশ্যই রফা' দিতে হবে। যাকে পড়ে, যাকে খায়, যাকে ধরে– সবই মাফঊ'লুন বিহী। সুতরাং কিতাব যেহেতু পড়েছে, তাই كتابًا عربيًّا হবে মাফ'উলুন বিহী এবং এতে নছব দিতে হবে। এভাবে বুঝে বুঝে পড়লে কিতাবে যদি 'ইরাব ভুলও দেয়া থাকে, আপনি ভুল করতে পারবেন না। আপনার বুঝ ও চিন্তা আপনাকে সঠিক 'ইরাব দিতে বাধ্য করবে। বস্তুত, যে কোনো জ্ঞান-সাধনার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মূল মন্ত্রই হলো 'কেন'তে।

এখানে একটি কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখা দরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে তালিবে ইলম ভাইয়েরা যখন আরবীভাষা শিখতে শুরু করেন, তখন প্রায় সবাই এতটুকু যোগ্যতা রাখেন যে, আরবী বাক্য পড়ে সঠিক অর্থটি বুঝতে পারেন, যদিও কারো কারো ই'রাবে ভুল হয়ে যায়। উপরের নীতি শুধু এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিপরীতে যারা আরবীভাষা ভালোভাবে না শিখে দু'এক জামাত অগ্রসর হয়ে গেছে, তারা সাধারণত গলদ অর্থই বুঝে।

- আরবী 'ইবারত শুদ্ধ করার জন্য অবশ্যই দক্ষ কোনো শিক্ষককে 'ইবারত শোনাতে থাকতে হবে। উস্তাদ যদি তালিবে ইলমের 'ইবারত

শুনে এ কথা বলে দেন– তোমার 'ইবারত বিশুদ্ধ হয়ে গেছে, তাহলেই নিজের উপর আস্থা রাখুন। এর আগ পর্যন্ত উস্তাদ নির্ভর থাকুন।

হেদায়া ও *জালালাইন* পড়ুয়া এমন অনেক ছাত্রদের দেখার সুযোগ হয়েছে, যারা নিজেদেরকে ভালো ছাত্র মনে করেন। অথচ তারা এখনো বিশুদ্ধভাবে আরবী 'ইবারত পড়তে পারেন না। আরবীতে উত্তরপত্র লিখে মনে করা হয়– আমরা ভাল ছাত্র। অথচ নাহু-ছরফের দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের লেখা শুদ্ধ নয়। আরবী লুগাত ও বালাগাতের বিষয়টি তো বাদই থাকলো।

- 'ইবারত চালু করার জন্য অবশ্যই পিছন থেকে নিয়মিত কিছু কিছু 'ইবারত পড়ুন। ৫/১০ পৃষ্ঠা যতটুকুই সম্ভব অর্থসহ পড়তে থাকুন। *এসো আরবী শিখি* পড়ার সময় আপনি যদি নিয়মিত এভাবে পড়তে থাকেন, এক বছর পর দেখবেন, আপনি দ্রুত 'ইবারত পড়তে পারছেন। তখন আপনাকে 'ইবারত পড়ে বোঝার জন্য থামতে হবে না। বরং অনেকটা বাংলার মত সহজ হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

- আরবী 'ইবারত সহজে বোঝার জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি পন্থা হলো– আরবীতে কথা বলা। ভুল হবে। তারপরও বলতে থাকুন। বলতে বলতে আরবীকে একেবারে বাংলার মত সাবলীল বানিয়ে ফেলুন। পাক্কা ইরাদা করুন, আমি সর্বদা আরবীতে কথা বলবো।

  কয়েকজন সাথী ঠিক করে নিন, যারা আপনার সঙ্গে আরবীতে কথা বলবে। আপনিও যাদের সঙ্গে আরবীতে কথা বলবেন। কেউ যদি না বলে আপনি নিজেই বলতে থাকুন। আপনার ভবিষ্যৎ গড়ুন। কে কী করল– দেখার মোটেও সুযোগ নেই। কেউ আপনাকে পাগল বললে বলতে দিন। হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ ফুয়াদ সাহেবকে ছাত্রযমানায় আরবী কথার জন্য সাথীরা পাগল বলত।[১৭] সেই 'পাগলটাই' এখন আরবীভাষার খেদমত করছে। 'আকলমন্দরা' কোথায় হারিয়ে গেল?!

- প্রাথমিক তালিবে ইলম ভাইদের জন্য আরেকটি বিষয় খুবই জরুরী। তা হল– *এসো আরবী শিখি*, *আত-তামরীন*, *কাছাছুন-নাবিয়্যীন* ইত্যাদি কিতাবগুলোর আরবী ইবারত মুখস্থ করে ফেলা। সব না হলে অন্তত কিছু কিছু বাক্য তো অবশ্যই মুখস্থ করা জরুরী।

---

১৭ বড় মুহসিন সাথী শিক্ষক মাওলানা শোয়াইব ছাহেব থেকে ঘটনাটি শুনেছি। তিনি সরাসরি মাওলানা ফুয়াদ ছাহেব থেকে শুনেছেন। আল্লাহ হযরত মাওলানা শোয়াইব ছাহেবের প্রতি রহম করুন। যমানা আমাদেরকে বহু দূর নিক্ষেপ করেছে। মুহাব্বতের এ দোয়া কি মাওলানার কাছে পৌঁছবে?

সুন্দর বলা ও সুন্দর লেখার জন্য প্রচুর এবং খু-ব প্রচুর মুখস্থ করতে হবে। আরবী এবং বাংলা, কিংবা অন্য যে কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে সে ভাষার দিকপাল লেখকদের ব্যবহার-শৈলী মুখস্থ করতে হবে এবং মৃত্যু-অবধি এ ধারা জারি রাখতে হবে। জ্ঞানের শুরুটাই তো হয় পড়া ও মুখস্থ করা দিয়ে। তাই মুখস্থ করা হোক আপনার ইলমী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে ব্যয় হোক আপনার নিশ্ছিদ্র মনোযোগ। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে সফল হতে হলে নিজেকে ভাঙতে হবে প্রচুর। তবেই গড়ে উঠবে জ্ঞানের আলীশান অট্টালিকা।[১৮]

'বিশুদ্ধ চিন্তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সুমহান কর্মের সুউচ্চ প্রাসাদ। চিন্তা শুদ্ধ হলে কর্মের যাত্রা হয় সঠিক ও গন্তব্যমুখী। গন্তব্যমুখী যাত্রাই একমাত্র পথিককে নিয়ে যেতে পারে আখেরি মনজিলের সোনালি সোপানে। চিন্তার শুদ্ধি ও সমৃদ্ধির নিক্তিতে মেপেই বলা যায় একজন মানুষ কতটুকু সম্পন্ন, কতটুকু সম্পূর্ণ।'

সফলতার পাঠশালা পৃ. ১১-১২

---

১৮ আরবীভাষার প্রাথমিক নির্দেশনার জন্য দেখা যেতে পারে *এসো আরবী শিখি পড়তে হলে*। আল্লাহ রিসালাটি অতি দ্রুত তালিবে ইলম ভাইদের খেদমতে পেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। *এসো আরবী শিখি*র মত একটি গবেষণাগ্রন্থ তাহকীক ও তাজদীদী চিন্তা নিয়ে পড়া ও পড়ানো দরকার। আক্ষেপের কিছু নেই– সব যামানাতেই এমন ছিল, লেখক যেমন তাহকীক ও ফাহমের সঙ্গে লিখেন, পাঠক এর কাছাকাছি ফাহম ও তাহকীকের মেজাজ নিয়েও পড়ে না।

সবকের পূর্বে

অবশ্যই মুতালা'আ করে বসুন

যে কোনো কাজের পূর্বে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিগ্রহণ বিবেকের দাবি। আকলমন্দ মাত্রই কাজের পূর্বে পরিকল্পনা করে, প্রস্তুতি নেয়। এ জন্যই আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, 'ওযু করার পর আবার ওযু করার জন্য লোটাটি ভরে রাখা আদবের অন্তর্ভুক্ত।'[১৯]

মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতির এই ইসলামী নির্দেশনা বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। উক্ত ফিকহকে সামনে রেখেই আমার ভাইদের সামনে নিম্নের কথাগুলো আরয করা হল :

উস্তাদ সবক পড়ানোর পূর্বেই ভালোভাবে ফিকিরের সহিত সবকটি অধ্যয়ন করে বসা একজন আদর্শবান তালিবে ইলমের পরিচয়। তালিবে ইলম পুড়ো সবক নিজেই বুঝে আসার চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব না হয়, অন্তত কতটুকু অস্পষ্ট, তা অবশ্যই নির্দিষ্ট করে আসবে। উস্তাদ বুঝিয়ে দিবেন– এমন আশা করা কোনোভাবেই একজন তালিবে ইলমের জন্য সমীচীন নয়।

ইমাম আবুল হাসান মাদায়েনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হযরত, আপনি ইলমের এত সুউচ্চ শিখরে পৌঁছলেন কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, কয়েকটি মাধ্যমে–

১. কখনো কারো উপর ভরসা করি নি। নিজেই বোঝার চেষ্টা করেছি।
২. ইলম অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশে সফর করেছি। বহু কষ্ট এ জন্য আমি সহ্য করেছি।
৩. ইলম শিখতে গিয়ে গাধার মত খেটেছি এবং গাধার মত ধৈর্য ধারণ করেছি।
৪. কাক যেমন প্রত্যুষে উঠে, ইলম শেখার জন্য আমিও সর্বদা প্রত্যুষে উঠে গেছি।'

---

১৯ আল্লামা ইবরাহীম হালাবী (মৃত ৯৫৬ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি, *গুনইয়াতুল মুতামাল্লী* পৃ. ৩৫

قال أبو الحسن المدائني رحمه الله تعالى في كتاب «الحكمة»: قيل للشعبيِّ: مِن أينَ لكَ كلُّ هذا العلم؟ قال: بنفيِ الاعتماد، والسير في البلاد، وصبرٍ كصبرِ الحمار، وبكورٍ كبكور الغراب.[২০]

হযরত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (মৃত ১৩৬২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

'এখন পর্যন্ত আমাদের মাদরাসাগুলোতে কিতাব পড়ানোর পদ্ধতি এই– তালিবে ইলম 'ইবারত পড়ে আর শিক্ষক তাকরীর করে যায়। কোথাও ইশকাল-আপত্তি থাকলে ছাত্ররা পেশ করে। অন্যথায় সবক সামনে এগুতে থাকে। তাদরীসের এই পদ্ধতি প্রাথমিক, এমনকি মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্যও উপকারী নয়। এই পদ্ধতি শুধু উচ্চ স্তরের ছাত্রদের জন্যই উপকারী, যারা বড় বড় আসাতেযা-মাশায়েখ থেকে ইস্তেফাদা করছে এবং করার যোগ্যতা রাখে। তাদরীসের এই পদ্ধতি অবশ্যই সংশোধনযোগ্য। পদ্ধতি হবে এই–

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছাত্রদেরকে (কিতাব বুঝতে) সহায়তা করা হবে না। বরং তাদের থেকেই উস্তাদ 'ইবারতের মতলব জিজ্ঞাসা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মাসআলায় অনেক মশ্‌ক ও তামরীন করাবেন। তবে যে সকল বিষয় ছাত্রদের আয়ত্বের বাইরে সেগুলো উস্তাদ নিজে হল্‌ করে দিবেন।

এই তরীকা সব সবকের ক্ষেত্রেই উপকারী। বিশেষত প্রাথমিক কিতাবের ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। *মীযান* ও *মুনশায়িব*, অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের অন্য কোনো কিতাবের সবক পড়িয়ে টেপ রেকর্ডারের মতো শোনা হয়। এতে ছাত্রদের কোনো ফায়েদা হয় না। বরং উচিত হলো, প্রত্যেক সবক খুব বেশি করে মশ্‌ক ও তামরীন করানো। যেমন, মাযীর বহছ পড়ানোর পর দু'-তিন

---

২০ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ৪/১৬০ (শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনী অংশ।)
উক্ত আরবী 'ইবারতটিতে কিছু বিকৃতি ছিল। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *সাফাহাতুন মিন ছাবরিল উলামা*-এর সাহায্যে ভুলগুলো শুদ্ধ করা হয়েছে। তবে *সাফাহাত* গ্রন্থে আবুল হাসান মাদায়িনীর স্থলে আলী ইবনুল মাদীনীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাদের যাচাই অনুযায়ী মনে হচ্ছে– বক্তব্যটির বর্ণনাকারী আবুল হাসান মাদায়েনী, ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনুল মাদীনী নন। আল্লাহর কাছে কামনা– *সিয়ার*-এর ভিন্ন কপিও যেন ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাহকীকের জন্য একাধিক নোসখার বিপল্প নেই।

শত ছীগা দিয়ে মশ্ক করাবে। মাসদার থেকে মাযীর ছীগা তৈরী করাবে। উর্দূ থেকে আরবীর অনুশীলন করাবে।'[২১]

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী (মৃত ১৪০২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শাহকার আত্মজীবনী ***আপবীতী***তে বলেছেন,

'আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি খাস শাগরেদদের পড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো নেসাবের পাবন্দী করতেন না। কোনো তা'লীমী মানহাজে সীমাবদ্ধ থাকতেন না। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন। আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে কিতাবী শিক্ষার তুলনায় মৌখিক শিক্ষার গুরুত্ব ছিল বেশি। আরবী সাহিত্যে খুব তাকীদ দিতেন। নাহবেমীর পড়ার সময় আরবী থেকে উর্দূ এবং উর্দূ থেকে আরবী বাক্য তৈরী লাযেম ছিল...।'[২২]

এরপর শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেন,

'আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদরাসার প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির একেবারেই মুখালিফ ছিলেন। তিনি এ পদ্ধতির খুবই বিরুদ্ধাচরণ করতেন। তিনি বলতেন, "এভাবে ছাত্ররা যোগ্য হয়ে ওঠে না। উস্তাদ সারা রাত মুতালা'আ করে দরসে এসে তাকরীর করবে, আর 'তলাবায়ে ইযাম' ইহসান করে চাইলে তাকরীর শুনতে পারেন, আবার না শোনার ইখতিয়ারও আছে তাদের!" তাঁর মাশহুর তা'লীমী পদ্ধতি ছিল এই– সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছাত্রের উপর। সে নিজেই মুতালা'আ করবে। সবক হল্ করে ছাত্র নিজেই উস্তাদকে শোনাবে। উস্তাদ শুধু 'হু', অথবা 'উহু' করবেন।'[২৩]

---

২১ ***তুহফাতুল উলামা*** ১/৩৪৫-৩৪৬ (*তাজদীদে তা'লীম ওয়া-তাবলীগ*-এর সূত্রে)।
ছোট্ট একটি কথা এখানে আরয করতে চাই– অনেক সময় আমরা নেসাবের বিভিন্ন কিতাবের ব্যাপারে ভিন্ন মন্তব্য করে থাকি। যদি আমাদের নেসাবে তা'লীমে নির্ধারিত সবগুলো কিতাব ভালোভাবে পড়া ও পড়ানো হতো, তাহলে হয়ত অনেক প্রশ্নই আমাদের যেহেনে আসতো না। তাই আমার তালিবুল ইলম ভাইদের বলবো, আপনারা নেসাবে নির্ধারিত কিতাবগুলো সঠিকভাবে পড়ুন। এর পরই আপনারা আমাদের আকাবির ও সালাফের চিন্তার সূক্ষ্মতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারবেন।

২২ **আপবীতী ১/৭১**

২৩ **আপবীতী ১/৮০**
কিতাবটি অধ্যয়ন করতে হলে এর মূল কপি অধ্যয়ন করা উচিত। একটি অনুবাদে দেখেছি– বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই অনুবাদক কিতাবের বিরাট অংশ ছেড়ে দিয়েছেন। অনুবাদটি বিভ্রাট থেকেও মুক্ত নয়।

=

وقال الشيخُ العلامةُ عبد الفتاح أبو غدة في ترجمة الشيخ الفقيه عيسى الْمَنُّون (م ١٣٧٩) رحمهما الله: «وكان من سيرته الْمثلى، وزكانته الفُضلى: أنَّه لا يحضرُ درسًا على عالِمٍ إلا طالعَه قبل الحضور مطالعةً تامةً، ووقفَ على نقاطه، وأحاط بغوامض مسائله».

ثم علَّق عليه: «ومن المؤسف جدًّا أن هذه العنايةَ التي كان عليها الشيخ وأمثالُه من عقلاء الطلبة قديمًا، أكاد أقول: انقرضتْ في أغلب طلاب اليوم، فتراهم يحضرون بأشباحهم، لا بأرواحهم! وأفئدتهم خواءٌ من موضوع الدرس ومسائله وصعابه! فلا سؤالَ بعلمٍ، ولا نقاشَ في موضع النقاش، ولا استفسار عما ينبغي الاستفسار عنه».

হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর উস্তাদ হযরত ঈসা মান্নুন শাফেয়ী[২৪] (মৃত ১৩৭৯ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনীতে বলেন,

'হযরতের অনুসরণীয় একটি গুণ ছিলো, তিনি কখনো পূর্ণ মুতালা'আ না করে সবকে বসতেন না। সকল উস্তাদের সবক মুতালা'আ করে বসতেন। শুধু 'ইবারত পড়েই ক্ষ্যান্ত হতেন না। বরং ফনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোও অনুধাবন করতেন।

কিন্তু আফসোস, বর্তমানের ছাত্রদের মাঝে এই গুণ আর পাওয়া যায় না। বলা যায়, তালিবে ইলমদের থেকে এ গুণ একেবারেই হারিয়ে গেছে। ছাত্ররা দেহ নিয়ে দরসে উপস্থিত হয়। প্রাণ নিয়ে নয়। দরসের আলোচ্য মাসায়েল ও কঠিন স্থানগুলোর ব্যাপারে তাদের মোটেও ধারণা থাকে না। তাই না তারা জানার জায়গায় প্রশ্ন করে, আর না ইশকাল-আপত্তির জায়গায় কোনো

---

২৪ হযরত শায়খের কিতাবে তাঁর উসতাদের জীবনী অংশটুকু খুবই উপকারী হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের তিনবারের বেশি পড়ার সুযোগ হয়েছে। তালিবে ইলম ভাইদের কাছে নিবেদন করবো– হযরত ঈসা মান্নুন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জীবনী অংশ বারবার পড়ুন। আরও যদি সুযোগ হয়, তাহলে *হায়াতু 'আলামিন মিন আ'লামিল ইসলাম* গ্রন্থটি পড়ুন। আল-হামদুলিল্লাহ, এটাও পড়ার সুযোগ হয়েছে।

ইশকাল পেশ করে। যেসব বিষয় একান্ত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন সেগুলোও তারা জিজ্ঞাসা করে না!'[২৫]

বস্তুত, দরসের কিতাব মুতালা'আ করে আসার অদম্য স্পৃহা যাদের নেই, ইলমী জীবনে তাদের সাফল্যের বাহ্যত কোনো দিক দেখা যাচ্ছে না। এটা সুন্নাতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যদি দয়া করেন সেটা ভিন্ন বিষয়। আদর্শ তালিবে ইলম তো শুধু দরসী কিতাব মুতালা'আ করেই ক্ষ্যান্ত হন না। বরং ফাহমুল কিতাবের সঙ্গে ফাহমুল ফনের মধুর মিশ্রণের জন্য একই শাস্ত্রের অন্যান্য কিতাবাদি এবং শুরূহ-হাওয়াশীও ভালোভাবে অধ্যয়ন করে আসেন।

বাস্তবে দরসের পূর্বে অধ্যয়ন যার স্নায়ু ও স্মৃতির এবং চিন্তা ও চেতনার সুগভীরে নিঃশব্দে মিশে একাকার হয়ে না যাবে, জোস্না-প্লাবিত ইলমী দরসেও সে ডুবে থাকবে তিমির অন্ধকারে। যেন 'অন্ধকারেরা একের উপর অপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।'[২৬] আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

২৫ *তারাজিমু সিত্তাতিন মিন ফুকাহাইল আলাম* পৃ. ২২০
আমার ভাইদের কাছে খুবই তাকীদের সাথে আবদার করব– এই কিতাবটি অবশ্যই আপনারা অধ্যয়ন করুন। এবং সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে বারবার পড়ুন। একজন তালিবে ইলমের ইলমী আদাব ও তাহকীকতের এক বিরাট ও খুবই মজাদার দস্তরখান এ কিতাব। এই কিতাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখতে পারেন আমাদের অপর গ্রন্থ *শাহকার রচনাবলি* (প্রথম খণ্ডে)।
২৬ সূরা নূরের ৪০ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত।

বুঝমান সাথীদের সঙ্গে মুযাকারা করুন

ইলম, মুযাকারা ও পরস্পর বারবার আলোচনার মাধ্যমে আত্মস্থ হয়। এ জন্যই বিখ্যাত ফকীহ তাবেয়ী হযরত আলক্বামা বিন কায়স (মৃত ৬২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,

إحياءُ العلمِ: المذاكرةُ.

'ইলমের মুযাকারাই ইলমকে জীবন্ত করে রাখে।'

তিনি আরো বলেন,

تذَاكرُوا الحديثَ؛ فإن حياته ذكره.

'তোমরা হাদীস মুযাকারা কর। কেননা হাদীসের মুযাকারাই হাদীসকে জীবন্ত রাখে।'[২৭]

বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। এজন্য কোনো দলিল পেশ করার মোটেও প্রয়োজন নেই।

মুযাকারা হতে পারে প্রাজ্ঞ আহলে ইলমের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। কিংবা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের কিতাবাদি মুতালা'আর মাধ্যমেও কখনো এ কাজ সমাধা হয়। তবে প্রথম দুই প্রকারই অধিক উপকারী। তৃতীয় প্রকার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য অনেক গভীর বুঝ ও সমঝের প্রয়োজন। ফাহমের অনুপস্থিতি বা কমতির কারণে অনেক পড়েও ফায়েদা হয় কম। কখনো তো ফিতনারও কারণ হয়।

মুযাকারার মাধ্যমে অজ্ঞাত অনেক তথ্য সামনে এসে যায়। মুযাকারা যখন প্রকৃত অর্থে মুযাকারা হয়, একটি মাসআলায় তখন বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরণের আপত্তি হতে থাকে, আর মুযাকারার মাধ্যমে এ-সকল আপত্তি দূর হয়ে যায়। মাসআলাটি সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। মুযাকারার মাধ্যমে বুঝ অনেক মযবূত ও পাকা

---

২৭ উভয়টি নস *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (১/৫৬২) থেকে গৃহীত।

হয়। মেধাবী সাথী বা কোনো যোগ্য উস্তাদের সঙ্গে মুযাকারা করে যে বুঝ ও ইলম অর্জন হয়, তা দিন-রাত অধ্যয়ন করে অর্জন করাও সম্ভব নয়।

ইমাম নববী (ইয়াহইয়া বিন শরফ মৃত ৬৭৬ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি সত্যই বলেছেন,

وَمُذاكرةُ حاذقٍ في الفنِّ ساعةً أنفعُ من المطالعة والحفظِ ساعاتٍ، بل أياماً!

'বস্তুত, অল্প সময় একজন যোগ্য-প্রাজ্ঞ আহলে ফনের সঙ্গে মুযাকারা করা, কয়েক ঘন্টার মুতালা'আ ও ইলম হিফয করার চেয়ে অধিক উপকারী, বরং কয়েক দিন টানা মুতালা'আ ও হিফযের চেয়েও বেশি ফলদায়ক।'[২৮]

এ জন্য একজন তালিবে ইলমের কর্তব্য হলো– এমন উস্তাদের কাছে পড়া যার সঙ্গে বিনা দ্বিধায় ইলমী মুযাকারা করা যাবে। যিনি প্রশস্ততার পরিচয় দিয়ে ছাত্রের ইলমী আলোচনা শুনবেন। ইলমী মুনাকাশা যিনি আদবের খেলাফ মনে করেন না। তালিবে ইলমেরই কর্তব্য– এমন উস্তাদের কাছে পড়া, যাকে সে তার চিন্তা ও প্রতিভা বোঝাতে পারবে। প্রতিভাবান তালিবে ইলমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলে। উপকারী ও ভালো হওয়ার সুবাদে উপকারী বস্তুকে যে কোনো স্থানে রাখা ও প্রকাশ করা কি উচিত হবে? এতে পরবর্তীতে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই।

ভালো উস্তাদের সঙ্গে এমন হামসবক বাছাই করতে হবে যারা খোলা দিলে মুযাকারা করতে প্রস্তুত। সঠিক কথা বোঝা এবং সবক সঠিকভাবে বুঝতে আগ্রহী– এমন মেজাজের তালিবে ইলমদের সঙ্গে মুযাকারা করতে হবে। মুযাকারা করাকে যারা সময় নষ্ট মনে করে, তাদের সঙ্গে নয়।

আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শাগরেদদের সঙ্গে একেকটি মাসআলা নিয়ে দীর্ঘ সময় মুযাকারা করতে থাকতেন। কখনো কখনো কয়েকদিন পর্যন্ত একই মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে থাকতেন। আবার কোনো কোনো মাসআলায় আরো বেশি সময়ও ব্যয় করতেন। তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে 'খালকে কুরআন'-এর মাসআলা নিয়ে মুনাযারা ও আলোচনা করেছেন সুদীর্ঘ ছ-য় মাস!! ছ-য় মাস?!!![২৯] অনুমান করুন– তাঁদের ইলমের বিস্তৃতি ও গভীরতা কেমন ছিল?! বাস্তবে তা অনুমান করাও

---

২৮ ***শারহু সহীহি মুসলিম*** ১/৩

২৯ ***উসূলুল বাযদাবী*** পৃ. ৯০

আমাদের মতো তালিবে ইলমদের জন্য অসম্ভব! বড়দের জীবনীগ্রন্থগুলো পড়তে থাকুন, শুরু-শেষ পড়তে থাকুন, এমন অনেক কিছুই আপনার নযরে আসবে ইনশা-আল্লাহ।

উস্তাদ বা হামসবকদের সঙ্গে মুযাকারা করার সময় আদবের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমে নিয়ত ঠিক থাকতে হবে। নিয়ত হবে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক ইলম প্রকাশ পাওয়া। এমন আশা না করা, আমার মন্তব্য যেন সঠিক প্রমাণিত হয়। বরং সর্বদা কামনা করা, আমার সঙ্গীর যেন পদস্খলন না হয়। তিনি যেন হেরে না যান।
দলিলের আলোকে আমার কথা ভুল সাব্যস্ত হলে ভুলের উপর অটল থাকা কোনোভাবেই উচিত নয়। এটা স্পষ্ট অহঙ্কার, যা বিরাট বড় গুনাহ। এমন কিছু যদি আমার পক্ষ থেকে হয়ে যায়, তাহলে এসব মুযাকারা-মুনাযারা সবই অনর্থক।

আমাদের বড়রা যেসব গুণে বড় হয়েছেন, এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ বিনয় ও তাওয়াযু'। এর বিভিন্ন প্রকাশক্ষেত্র রয়েছে। এর মধ্যে অত্যন্ত কঠিন ও শিক্ষণীয় প্রকাশক্ষেত্র হল– নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেওয়া। সমাজে যার বিশেষ অবস্থান নেই, তার জন্য এটা সোজা মনে হলেও বাস্তবে এটা অত্যন্ত কঠিন, অনেকটা পাথর চিবিয়ে খাওয়ার মত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল– এ বিষয়ে বড়দের ঘটনা বেশি এবং অনেক বেশি! আধিক্যের কারণে অনেকটা অবাক হতে হয়। সিরাতে মুস্তাকীমের উপর থাকতে হলে এসব গুণ আমাদেরও অর্জন করতে হবে।[৩০]

---

৩০ প্রায় প্রত্যেক বড় ব্যক্তির জীবন-অধ্যয়ন করলেই এ বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। হ্যাঁ, জীবনী-গ্রন্থগুলোতে সবকিছু উঠে আসে না– এটাই তো বাস্তবতা। সেটা তো সম্ভবও নয়। বিশেষ অনুসন্ধান ছাড়াই লেখকের কাছে এ ধরণের চল্লিশের অধিক ঘটনা জমা হয়েছে।

ولا أملكُ نفسي عن قصةٍ في الباب، حكاها الإمام أبو بكر ابن العربيِّ رحمه الله تعالى كتابه «أحكام القرآن»؛ فإنها رائعةٌ رائعةٌ، أخّاذةٌ أخّاذةٌ، فها إلى القارئ الكريم:

قال: «أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرةٍ: وصلتُ الفسطاطَ مرةً، فجئتُ مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، وحضرتُ كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلسٍ جلستُ إليه: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم طلَّقَ وظاهر وآلى.

فلمَّا خرج تبعتُه، حتى بلغتُ معه إلى منزله في جماعةٍ، فجلس معنا في الدهليز، وعرَّفهم أمري؛ فإنه رأى إشارة الغربة، ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفضَّ عنه أكثرهم، قال لي: أراك غريبًا، هل لك من كلامٍ؟ قلتُ: نعم، قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، فقاموا، وبقيتُ وحدي معه، فقلتُ له:

حضرتُ المجلس اليوم متبركًا بك، وسمعتك تقولُ: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقتَ، وطلَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقتَ، وقلتَ: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم -

তাওয়াযু অবলম্বন করতে হবে। কঠোর শব্দ বলা যাবে না। দলিলের আলোকে মত ইখতেয়ার করতে হবে। মত নির্বাচন করে দলিলের তালাশে লেগে থাকা একেবারেই অনুচিত।[৩১] হ্যাঁ, মত যদি হয় মাযহাবের ইমামের, কিংবা বড় বড় এক জামাত আইম্মায়ে কেরামের, অথবা উম্মতের সকল ওলামায়ে কেরামের, তাহলে অবশ্যই এটা দোষণীয় নয়। কারণ, তাঁরা যা কিছু বলেছেন দলিলের আলোকেই বলেছেন। হয়ত কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বুঝে আসছে না। এটা আমাদের দুর্বলতা। তবে সেজন্য যে কোনো দলিলকেই টেনে-হেঁচড়ে দাঁড় করানো মোটেও উচিত হবে না।[৩২]

আমাদের মাদরাসাগুলোতে মুযাকারার পদ্ধতি হলো, উস্তাদ পড়িয়ে যাওয়ার পর আমরা পরস্পর সেটাকে আবার আলোচনা করি। আমাদের উদ্দেশ্য হয়, যারা সবক কম বুঝেছে, কিংবা একেবারেই বুঝে নি তারা যেন বুঝে যায়। এ মুযাকারা ইবতিদায়ী তালিবে ইলমদের জন্য উপকারী হলেও মুতাওয়াস্সিতা জামাতের তালিবে ইলমদের

يكن، ولا يصحُّ أن يكون؛ لأنَّ الظهار منكرٌ من القول وزورٌ، وذلك لا يجوزُ أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم.

فضمَّني إلى نفسه، وقبَّل رأسي، وقال لي: أنا تائبٌ من ذلك، جزاك الله عني من معلمٍ خيرًا.

ثمَّ انقلبتُ عنه، وبكَّرتُ إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيتُه قد سبقني إلى الجامع، وجلس على المنبر، فلمَّا دخلتُ من باب الجامع ورآني، نادى بأعلى صوته: مرحبًا بمعلِّمي! افسحوا لمعلمي! فتطاولتْ الأعناقُ إليَّ، وحدَّقت الأبصار نحوي، وتبادر الناسُ إليَّ يرفعونني على الأيدي، ويتدافعونني حتى بلغتُ المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف: في أي بقعةٍ أنا من الأرض؟! والجامعُ غاصٌّ بأهله، وأسَالَ الحياءُ بدني عرقًا./

وأقبلَ الشيخُ على الخلقِ، فقال لهم: أنا معلِّمكمْ، وهذا معلمي، لـمَّا كان بالأمس قلتُ لكم: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلَّق وظاهر، فما كان أحدٌ منكم فقِهَ عني، ولا ردَّ عليَّ، فاتَّبعني إلى منزلي، وقال لي كذا وكذا، - وأعاد ما جرى بيني وبينه،- وأنا تائبٌ عن قولي بالأمس، وراجعٌ عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يُعوِّل عليه، ومن غاب فليُبلِّغه مَن حضر، فجزاه الله تعالى خيرًا، وجعل يحفل في الدعاء، والخلق يُؤمِّنون.

فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، والاعترافِ بالعلم لأهله على رؤوس الملأ مِن رجلٍ ظهرت رياسته، واشتهرت نفاسته، لغريبٍ مجهولِ العين، لا يَعرِف: مَن، ولا مِن أين؟ فاقتدوا به ترشدوا». انتهى من (١/١٨٠-١٨١) في تفسير البقرة برقم الآية: ٢٢٧.

৩১ *ইসলাম আওর জিদ্দাত পসন্দী* পৃ. ৫০ (মুহাম্মাদ মুশাররফ)।

৩২ যারা ফকীহুন নফস তাদের বিষয়টা অবশ্য ভিন্ন। ফাক্বাহাতের কারণে কখনো ফকীহ স্বাভাবিকভাবে কিতাবের বিপরীত কিছুও বলতে পারেন। তথ্য-তালাশ করলে দেখা যায়, ফকীহের কথাই সঠিক। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনীগ্রন্থ *মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ*-এর ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় একটি নমুনা উঠে এসেছে।

জন্য এটা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। কারণ, এতে ছাত্ররা পর-নির্ভর হয়ে পড়ে। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত মুযাকারা এ মুযাকারা নয়। এটার পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ :

প্রথমে যে কোনো শাস্ত্রের একটি মাসআলা নির্ধারণ করতে হবে। এরপর মুযাকারার পূর্বে সকল সঙ্গী উক্ত মাসাআলা হল্ করার জন্য বিভিন্ন কিতাব ঘাঁটবে। নিজেরাও চিন্তা করতে থাকবে। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে মুযাকারায় 'বসতে' হবে। এ প্রকারের মুযাকারা সালাফের ইলম অর্জনের এক বিশেষ পদ্ধতি। সালাফের এ সুন্নাত আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তা যিন্দা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তবে সবকের মুযাকারা ও তাকরারও খু-ব গুরুত্বের সঙ্গে করা দরকার। বাজ পাখির মত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পঠিত গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য খুঁটে খুঁটে পড়া দরকার। এ তাকরার ও মুযাকারাই হতে পারে কুরআন-সুন্নাহ বোঝার সোনালি সোপান। এর মাধ্যমেই তৈরী হতে পারে ইলমের সুউচ্চ প্রাসাদ। এ তাকরারই আমাদের উপহার দিতে পারে আলো ঝলমল ভুবন এবং জোছনা প্লাবিত জগৎ।

কিন্তু আফসোস, শত আফসোস, অবাঞ্ছিত অলসতা আজ আমাদেরকে ভিমরুলের মতো ছেঁকে ধরেছে। বরং আমাদের চেতনা ও বোধের উপর অশ্বারোহীর মত জেঁকে বসেছে। যেন ছুটে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমাদের আসাতিযা-আকাবির ইলমের এ দুর্গম মরুভূমিতে তাকরারকে বানিয়েছিলেন উষ্ট্রীর মত পাহাড়সম বাহন। তাকরারের পিছনে মেধা ও শ্রম ব্যয় না করে তাকরারকে আমরা গ্রহণ করেছি উপহাসরূপে। আফসোস!

তাকরার করা ও করানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখা খুব জরুরী :

- তাকরার করার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করবো।
- কিতাবের আলোচ্যবিষয়টি সহজে বোঝানোর জন্য সমাজ থেকে কোনো উদাহরণ দিতে হলে, পূর্ব থেকেই আমি প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো।
- পঠিত কিতাবের 'ইবারত খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে এই পুরো গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে ফায়েদা নিতে পারি।
- কিতাবের শরাহ বা একই বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব দেখে তাকরার করানোর চেষ্টা করবো। কিতাবের কোনো বিষয় খটকাপূর্ণ মনে হলে সাথীদের কাছে তা পেশ করবো, যদিও উসতাদ এ বিষয়ে কিছু না বলেন। তাকরারের প্রতিটি আলোচনা যেন সমঝ ও ফাহমের সঙ্গে হয়। এমন যেন না হল– এটা এমন কেন? কারণ, হুযূর বলেছেন! নিজে বুঝে বুঝে প্রতিটি কথা গ্রহণ করবো।

আফসোস, এখন আমরা অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। অধিকাংশ মাদরাসাগুলোতে ভালোভাবে তাকরার করার তালিবে ইলম পাওয়া যায় না। যার ফলে অনেক সময়ই ভালো তালিবে ইলমদের জন্য তাকরার করা আর সময় নষ্ট করা সমার্থক হিসেবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমীন।

وليكنْ على ذُكرِكَ دائمًا أيها القارئ الكريمُ، أنَّ الاشتراكَ في التسمية لا يلزمُ الاشتراك في بعض الأحكام، فكيفَ يلزم في جميع الأحكام، بل الأحكام علاقتها بالحقائق، والأدلة والمناطات، لا بالأسامي والاصطلاحاتِ. «الوجيز» للشيخ عبد المالك حفظه الله تعالى ص٥٨

প্রতিটি বিষয় গভীর চিন্তা করে পড়ুন

আমরা যদি সঠিক অর্থে ইলম অর্জন করতে চাই এবং প্রকৃত অর্থে কুরআন-সুন্নাহর ধারক হতে চাই, তাহলে পঠিত গ্রন্থের প্রতিটি কথা নিয়ে ভালোভাবে ফিকির করতে হবে, দীর্ঘ চিন্তা করতে হবে। একবার নয়, বারবার ভেবে দেখতে হবে। বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে হবে। শুধু পৃষ্ঠা উল্টিয়ে কিতাব শেষ করলে কখনো ইলমের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যাবে না। হাজার-হাজার গ্রন্থ উল্টালেও আলেম হওয়ার সৌভাগ্য কখনোই হবে না।

আপনি একটি লেখা পড়ার পর বারবার তা নিয়ে চিন্তা করুন। ভেবে দেখুন, কোথাও কোনো তথ্যে ভুল আছে কিনা? কোথাও উপস্থাপনায় অসৌন্দর্য রয়ে গেছে কিনা? লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বোঝার চেষ্টা করুন, কোথায় লেখক পূর্ণ দরদ ও মুহাব্বতের সহিত লিখেছেন? কোথায় তিনি স্বাভাবিক হয়ে লিখেছেন? কোথায় কঠোরতার পথ ইখতেয়ার করেছেন? কোথায় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে? কোথায় পূর্ণ মধ্যপন্থা অবলম্বনে সক্ষম হয়েছেন? কোন কথাটা না বললে লেখাটি আরো সুন্দর হতো? কোন কথাটি পুরো আলোচনার মগজ? লেখকের পুরো আলোচনার মূল বক্তব্যটা কী– সেটা এক-দু' কথায় বলার ও লেখার চেষ্টা করুন। লেখকের কথা থেকে অতিরিক্ত কী কী বোঝা যায়? লেখকের কথাগুলোর পরস্পর যোগ-সুত্র কী? কথাগুলো কি লেখক চিন্তা করে লিখেছেন?

যে ব্যক্তি কাজের মানাত্ব যে ভুলে যাবে, কিংবা বুঝেও সে অনুযায়ী আমল করবে না, তার কাজ শুধুই রসম-রেওয়াজে পরিণত হবে। এর মাধ্যমে না তার বিশেষ উপকার হবে, আর না উম্মত বিশেষ ফায়েদা পাবে। তাই হে প্রিয় তালিবে ইলম ভাই আমার, পড়ারও মানাত্ব বুঝে নিন। একটি লেখাই বিভিন্ন দিক সামনে রেখে বারবার অধ্যয়ন করুন। কিতাব শেষ করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো– কিতাবের ইলম জানা ও শাস্ত্র বোঝা। তাই মূল উদ্দেশ্য ভুলে যাবেন না।[৩৩]

---

৩৩ অনেক সময় আমরা উপরোক্ত কথাটির গলদ প্রয়োগ করি। ফলে এমনসব কিতাবও পূর্ণরূপে পড়া থেকে বিরত থাকি, কিংবা বিরত থাকলে তা দিয়ে দলিল দেই, যেসব কিতাব আদ্যোপান্ত পড়াও মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এসব কিতাব পুরো পড়া ছাড়া কিতাবের ফন পূর্ণরূপে বোঝা ও আয়ত্ব করা সম্ভব নয়।

দেখুন, আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরাম তো শুধু একটি বিষয়কে লক্ষ্য করে ***ফাতহুল বারী***র মত বিরাট গ্রন্থ পুরোটাই মুতালা'আ করেছেন, যা বর্তমানে পঁচিশ খণ্ডে ছেপেছে! খুব আগের ঘটনা নয়, হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী (মৃত ১৩৯৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-ই এমন করেছেন।[৩৪]

قال الْمثَنَّى: سألتُ أبا عبد الله، أيُّهم أفضلُ: رجلٌ أكلَ فشبع، وأكثر الصلاة والصيام، أو رجلٌ أقلَّ الأكلَ، فقلتْ نوافِلُه، فكان أكثرَ فكرةً، فذكر ما جاء في الفكرة «تفكرُ ساعةٍ خيرٌ من قيامِ ليلةٍ»، أو كما قال، فرأيتُ عنده هذا أكثرَ. انتهى.

'হযরত মুছান্না বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করেছি, এক ব্যক্তি খেয়ে-দেয়ে তৃপ্ত হয়ে বেশি বেশি নফল নামায-রোযায় ব্যস্ত থাকে। আরেক ব্যক্তি অল্প আহার করে, স্বল্প নফল পড়ে, তবে বেশি-বেশি চিন্তা-ফিকির করে। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, ফিকিরের ব্যাপারে আমাদের বড়রা বলেছেন, "কিছু সময় ফিকির করা সারা রাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম।" হযরত মুছান্না বলেন, আমি হযরত ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে ইবাদতের তুলনায় ফিকিরই বেশি দেখেছি।'[৩৫]

ফিকিরের গুরুত্ব বোঝার জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। কুরআন মাজীদ দেখলেই বুঝতে পারবেন– কুরআনুল কারীমের আয়াতে আয়াতে আল্লাহ বিভিন্ন শব্দে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে বান্দাদেরকে চিন্তা-ফিকিরের দিকে আহ্বান করেছেন। যে কোনো কিতাবের সবচে' বড় ফিকরী আহ্বান হলো, কিতাবের প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত সুচিন্তিত হওয়া। চিন্তা করলে প্রতিটি শব্দ থেকে চিন্তার আলো বেরিয়ে আসা। কুরআন মাজীদ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো গ্রন্থ এমন নেই, যে গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ থেকে ইলমের ঝর্ণা উৎসারিত হতে পারে।

---

৩৪ উভয়টি তথ্য হযরাতুল উসতায মাওলানা জিকরুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম থেকে শ্রুত।

৩৫ হযরত মাওলানা আবদুল হাফীয মক্কী (মৃত ১৪৩৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *তাবাকাতুল হানাবিলাতিস সূফিয়্যা* ১/১১৭-১১৮

শরীয়ত প্রতিটি অঙ্গ-পতঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত দিয়েছে। তাহলে আকলের ইবাদত কী? আকল তো মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।[৩৬] এর কি কোনো ইবাদত থাকবে না? এটা তো হতে পারে না! 'আকলের ইবাদত হলো, চিন্তা করে সবকিছু করা। যদি চিন্তাই না করা হয় তাহলে এ আকল দিয়ে কী লাভ?'[৩৭]

প্রসঙ্গত এখানে আরেকটি কথা বলা উপকারী মনে হচ্ছে। সেটা হলো, চিন্তা-ভাবনা করে পড়া, চিন্তা-ফিকির করে একটা সূক্ষ্ম কথা বের করা– এসবই উস্তাদ থেকে শিখতে হবে। আদর্শ উস্তাদ এ-সবই তালিবে ইলমদের শিক্ষা দেন। তাই কিতাবের পাতার সঙ্গে সঙ্গে উস্তাদের ফিকির ও ফাহম খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করা প্রত্যেক তালিবে ইলমের একান্ত কর্তব্য। এটাই একজন তালিবে ইলমকে তার কাঙ্খিত স্তরে পৌঁছাতে পারে।

আফসোস, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে অধিকাংশ তালিবে ইলম ভাইয়েরা অনুবাদ ছাড়া কিতাব বুঝেন না। তরজমা ছাড়া অন্য কিছুকে ইলম মনে করা হয় না। উস্তাদের ইলম ও ফাহম অনেকের কাছে 'অতিরিক্ত' কথাবার্তা। ইন্না লিল্লাহ!!!

যেসব আসাতেযায়ে কেরাম তালিবে ইলমদের তারবিয়াত করেন, ইলম, ফাহম, ফিকর ও আদবের অনুশীলন করান তাদেরকে 'ছাত্র' ভাইয়েরা পছন্দ করেন না। পছন্দ তো না-ই করার কথা। যে উস্তাদ ভুলের সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে তারবিয়াত করেন, তিনিই ছাত্রদের অধিক কল্যাণকামী বন্ধু। তালিবে ইলমদের জন্য বি-রা-ট নেয়ামত। এমন উস্তাদের শাসন মানা এবং হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁকে মুহাব্বত করা প্রত্যেক তালিবে ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু অনেক ভাইয়েরা বিষয়টি বুঝেন না। হয়ত বোঝার চেষ্টাও করা হয় না।

***

---

৩৬ অনেকে না বুঝে ইলম ও বিভিন্ন কিছুকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত বলেন। এটা ঠিক নয়। অনেক বড় বড় ইমামগণ আকলকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাবেয়ী মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখ্খীর (মৃত ৮৬ হি.)-এর কথা দেখুন *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে (৯/৬৭)। তাবেয়ী আতা বিন আবী রাবাহ (মৃত ১১৪ হি.)-এর নস দেখুন ***হিলইয়াতুল আউলিয়া*** গ্রন্থে (৩/৮৫)। বিখ্যাত ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক (মৃত ১৮১ হি.)-এর বক্তব্য দেখুন ***ফাযাইলু আবী হানীফা*** কিতাবে (পৃষ্ঠা ২৭১)। ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৯৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর কথা পড়ুন তাঁর রচিত ***তালবীসু ইবলীস*** গ্রন্থের ভূমিকায়। তাঁর কথাটি *রিসালাতুল মুসতারশিদীন*-এর টীকায়ও দেখা যেতে পারে। আমাদের এখান থেকেই পড়ার সুযোগ হয়েছে।

৩৭ এ কথাটি মূলত উসূলুল ফিকহের বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলিমে দ্বীন ও প্রখ্যাত বুযুর্গ মনীষী হযরাতুল উস্তায মাওলানা মুফতী ইয়াহইয়া যশোরী দামাত বারাকাতুহুম-এর যবান থেকে শ্রুত। এখানে কথাটি নিজের ভাষায় নকল করা হয়েছে।

পড়ার কিছু নুমনা

ক. একটি বাংলা 'ইবারত দেখুন :

আমাদের আলিমসমাজের একজন শক্তিমান লেখক লিখেছেন, 'মুসলিম সমাজে একশ্রেণির লোক এমন সব সময়ই ছিল যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। যেমন, কেউ কেউ মত করেছে যে পশু কুরবানী না দিয়ে সমপরিমাণ অর্থ দান করে দিলে আরও ভালো হয়।'

প্রথম বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হত, 'মুসলিম হয়ে মুসলিম সমাজে থেকেও সর্বদাই কিছু ভাই ইসলাম সম্পর্কে ধারণা রাখেন না।'

এ বাক্যে কয়েকটি বিষয় এসেছে, যা পিছনের বাক্যটিতে নেই।

- ঐ ভাইদের প্রতি দরদ ও ভালবাসা। দাওয়াতী ময়দানে এর কোনো বিকল্প নেই। ভাষা দিয়ে নয়, হৃদয়ের দরদ দিয়েই মূল কাজ হয়।
- এ অজ্ঞতার তীব্র নিন্দা। লক্ষ্য করুন 'মুসলিম হয়ে মুসলিম সমাজে থেকেও।'
- উপরের বাক্যটি বক্তব্যের ক্ষেত্রে সাবলীল হলেও লেখা হিসেবে কথাটি সাবলীল নয়।

দ্বিতীয় বাক্যটি লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, লেখক বিশাল কদম ফেলেছেন। মাঝখানে রেখে গেছেন বিরাট 'লাল দিঘির ময়দান'। তিনি যেসব সাধারণ পাঠকের জন্য লেখাটি লিখেছেন তাদের জন্য এত বিরাট ময়দান পাড়ি দিয়ে দু'বাক্যের যোগ-সুত্র খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য তো অবশ্যই।

বিরাট শূন্যতাটা এভাবে পূরণ করা যেত, 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে তো আমাদের অজ্ঞতা থাকেই। এমনকি দ্বীনের অতি স্পষ্ট বিষয়েও আমাদের মূর্খতা প্রকাশ পেয়ে যায়। দেখা যায়, আমাদের কোনো কোনো ভাই বলে বসেন, কুরবানী করার কী প্রয়োজন? সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দিলেই তো বেশি ভাল?'[৩৮]

খ. কুরআন মাজীদের একটি আয়াত দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা সূরা হিজরের ৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ﴾

---

৩৮ উদাহরণটি ৬ই রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরীতে লেখা গ্রন্থকারের রোজনামচার পাতা থেকে নেয়া।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'আমি তো (এভাবে) নাযিল করি না ফিরেশতাদেরকে, তবে (নাযিল করি) চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য, আর তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।'

আরেকটি বাংলা তরজমায় আছে, 'আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফায়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।'

পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন– আয়াতে উল্লেখিত حق শব্দের অনুবাদ একজন করেছেন শুধু 'ফায়সালা' দিয়ে। অপরজন করেছেন 'চূড়ান্ত ফায়সালা' দিয়ে।

কিন্তু কুরআন মাজীদের তারকীব ও অতলস্পর্শী মর্মের সঙ্গে কি তরজমা দু'টি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ﴿بِالْحَقِّ﴾-এর শাব্দিক অর্থ হল– সত্যের সঙ্গে। এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল– শাস্তি।[৩৯]

ইবনে 'আশূর (মৃত ১৩৯৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন,

والمرادُ بـ(الحقِّ) هنا: الشيءُ الحاقُّ، أيْ: المقضيّ، مثل إطلاق القضاء بمعنى المقضي. وهو هنا صفةٌ لمحذوفٍ، يُعلم من المقام، أي: العذاب الحاقّ.

'এখানে حق দ্বারা উদ্দেশ্য হল– ফায়সালাকৃত কিছু। যেমন মাকযী (ফায়সালাকৃত) শব্দের অর্থে কাযা (ফায়সালা) শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। حق শব্দটি এখানে উহ্য মাউসূফের সিফাত। উহ্য মাউসূফটি আয়াতে অবস্থান থেকেই বোঝা যায়। অর্থাৎ ফায়সালাকৃত শাস্তি।'[৪০]

প্রশ্ন হতে পারে– حقّ শব্দ দিয়ে কেন বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে? এর উত্তরে আবূস সা'ঊদ (মৃত ৯৮২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন,

﴿إلاَّ بِالحَقِّ﴾: أي: ملتبسًا بالوجه الذي يحقُّ ملابسةُ التنزيل به، مما تقتضيه الحكمة، وتجري به السنة الإلهية، والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم، وهم هم ومنزلتهم في الحقارة والهوان منزلتهم، مما لا يكادُ يدخل تحت الصحة والحكمة أصلاً.

---

৩৯ *তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৬৮২*

৪০ *আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর ১৪/৯*

অর্থাৎ তারা যেভাবে ফেরেশতা আসার দাবি জানিয়েছে, সেটা আল্লাহ তা'আলার হিকমত-পরিপন্থী। কোনো কওমের নির্ধারিত শাস্তির সময় আসার পূর্বেই ফেরেশতা পাঠিয়ে দেয়া তো হিকমতের দাবি নয়। আর আল্লাহ তো নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া ফেরেশতা পাঠানও না। যদি পাঠান, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পাঠানো আল্লাহর হিকমত-পরিপন্থী। প্রজ্ঞাহীন ও হিকমত-পরিপন্থী কোনো কাজ কখনোই আল্লাহ তা'আলার শানে সম্ভব নয়।[৪১]

দেখুন, ইমাম রাগেব আসফাহানী (মৃত ৫০২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি মূলনীতির আকারে কত সুন্দর কথা বলেছেন,

والحقُّ يُقال على أوجهٍ: ...

والثاني: يُقال للموجَدِ بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يُقال: فعل الله تعالى كله حقٌّ.

'حق শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। .. দ্বিতীয় অর্থ– প্রজ্ঞার দাবিতে কৃত যে কোনো কর্মকেও حق বলে। এ জন্যই আল্লাহ তায়া'লার সব কর্মকে حق বলা হয়।'[৪২]

পাঠক অবশ্যই খেয়াল করে থাকবেন– উভয়টি তরজমাতেই 'ফায়সালার জন্য' বলা হয়েছে। অথচ 'জন্য'-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে ل। আয়াতে তো এসেছে ب। আবূস সা'ঊদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়– ب হরফুল জরটি এখানে মুসাহাবাত বা সাথীত্বের অর্থ প্রদান করছে। অর্থাৎ ফেরেশতারা নাযিল হলে ফায়সালাকৃত আযাবের সঙ্গেই নাযিল হবে। 'জন্য' শব্দ দিয়ে তরজমা করায় এ মর্মটি নষ্ট হয়ে গেছে।

সংক্ষেপে আমরা এই আলোচনা থেকে তিনটি বিষয় জানতে পারলাম–

---

৪১ *ইরশাদুল আকলিস সালীম ইলা মাযায়াল কুরআনিল কারীম* ৪/৯

৪২ *মুফরদাতু আলফাযিল কুরআন* পৃ. ১৩২

ইমাম রাগেব আসফাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পুরো কুরআন মাজীদ ইস্তেকরা করে বিভিন্ন স্থানে অনেক চমৎকার তাহকীক পেশ করেছেন। এ থেকে তাঁর কুরআন মাজীদের প্রতি অসামান্য ভালোবাসা ও কুরআনের ভাষাজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ প্রাজ্ঞতা ফুটে উঠে। এত সুন্দর ও অপূর্ব তাহকীক তিনি পেশ করেছেন, যেসব তাহকীক পেশ করতে মোটা মোটা অভিধানগুলোও অক্ষম। এ কিতাব আমাদের হিফয করা দরকার।

مضت الدهور وما اتين بمثله ولقد اتى فعجزن عن نظرائه

- حق শব্দটি এখানে সত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।
- حق শব্দটি আযাবের অর্থে ব্যবহার করার কারণ।
- 'জন্য' দিয়ে তরজমা করলে আয়াতের মূল মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

আমাদের নাকেস রায়ে তরজমা এমন হলে সুন্দর হতো– 'নাযিল করি না আমি ফেরেশতাদের ফায়সালাকৃত আযাব ছাড়া। আর তাদেরকে তো তখন অবকাশ দেয়া হবে না।'

তারপরও পাঠক অবশ্যই তরজমার দুর্বলতা বুঝতে পারছেন। 'ফায়সালাকৃত আযাব' যদিও শব্দটির উদ্দেশ্য, কিন্তু حق শব্দের মধ্যে লুকায়িত হিকমত ও প্রজ্ঞা এখানে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। তাই অনুবাদকদের জন্য এমনসব স্থানে টীকা সংযুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

গ. আয়াত দিয়ে ইস্তেদলাল দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ﴾

'আমি কমতি করি নি কিতাবে (উল্লেখ করতে) কোনো কিছু।'[৪৩]

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ﴾

'তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমি নাযিল করেছি আপনার উপর কিতাব, এমন অবস্থায় যে, তা তেলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে তাদেরকে?'[৪৪]

কেউ যদি এ দু'টি আয়াত দিয়ে কেয়াসের বিরুদ্ধে দলিল দেয় আপনি ভয় পাবেন না। আসুন, আয়াত দু'টি নিয়ে একটু ভেবে দেখি :

দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝতে পারছেন, এই আয়াতে كتاب-এর অর্থ কুরআন মাজীদ। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে যথেষ্ট হচ্ছে না– তা এই আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। যিনি কেয়াসের বিরুদ্ধে দলিল দিতে চান, তিনি বলতে চান, বিধানের ক্ষেত্রে কি কুরআনই

---

৪৩ সূরা আন'আম, আয়াত নং : ৩৮
৪৪ সূরা আনকাবূত, আয়াত নং : ৫১

তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? আমাদের জন্য কি তার এ ব্যাখ্যা মানা জরুরী? বরং তার এ ব্যাখ্যা কি মোটেও সহীহ? তাহলে এর পূর্বের আয়াতটি দেখুন,

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايْتٌ مِّنْ رَّبِّهِ. قُلْ إِنَّمَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللهِ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

'আর তারা বলল, কেন নাযিল করা হলো না তার উপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলি তার রবের পক্ষ হতে? আপনি বলুন, নিদর্শনাবলি তো একমাত্র আল্লাহর কাছে। আর আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'[৪৫]

প্রিয় তালিবে ইলম ভাই, এবার আপনি বলুন, কিভাবে আমরা আমাদের ঐ ভাইয়ের ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারি?! পূর্বের আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে তো স্পষ্টই বোঝা যায়– এখানে যথেষ্ট হওয়ার দিক হল, আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট হওয়া, বিধান হিসেবে নয়। যদিও অন্যান্য দলিলের কারণে উসূলের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদই যথেষ্ট।

এবার প্রথম আয়াত নিয়ে ভাবি :

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত كتاب শব্দটির অর্থ আমাদের প্রচলিত অর্থের কিতাব নয়। বরং উদ্দেশ্য হল– 'ভাগ্য-লিপি'। এ আয়াতটিরও পূর্বের অংশ লক্ষ্য করে দেখুন :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. مَا فَرَّطْنَا ...﴾

'নয় যমিনে বিচরণশীল কোনো প্রাণী, আর নয় কোনো পাখি যে উড়ে বেড়ায় তার দু'ডানা দিয়ে তোমাদের মত জাতি ছাড়া কিছু। আর আমি কমতি করি নি ...।'

এবার আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্য দেখুন,

وجملةُ ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ﴾ معترضة لبيان سعة علم الله تعالى، وعظيمِ قدرته، فالكتابُ بمعنى المكتوب، وهو المكني عنه بالقلم، المرادُ به ما سبق في علم الله تعالى، وإرادته الجارية على وفقه.

---

৪৫ সূরা 'আনকাবূত, আয়াত নং : ৫০

وقيل: الكتابُ: القرآنُ. وهذا بعيدٌ؛ إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير، فقد أُوْرِدَ: كيف يشتمل القرآنُ على كل شيءٍ؟!. انتهى.[৪৬]

كتاب **শব্দটির মুনাসাবাতে আরেকটি উদাহরণ দেখুন :**

ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃত ৭৯৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কুরআনের একটি শব্দ পিছনের সঙ্গে শব্দগত দিক দিয়ে সম্পৃক্ত হলেও অর্থগত দিক থেকে সম্পৃক্ত ধরা ভুল'– এই আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

ومما يتعيَّن أن يكون منقطعًا قوله تعالى: ﴿وَلَآ أَصۡغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٍ﴾، مستأنَفٌ؛ لأنه لو جُعل متصلاً بـ﴿يَعۡزُبُ﴾ لاختلَّ المعنى؛ إذ يصير على حد قولك: ما يعزب عن ذهني إلا في كتابٍ، أي: استدراكه[৪৭].

যারকাশী রহমাতুল্লাহি আলাইহি كتاب শব্দটি আমাদের কাছে প্রচলিত অর্থে ধরেছেন বিধায় তিনি উল্লেখিত আয়াত-অংশটুকুকে পিছনের ফেয়েলের সঙ্গে মুতা'আল্লেক ধরাটা মুশকিল মনে করেছেন। অথচ যদি كتاب শব্দটিকে আল্লাহর ইলমের অর্থে ধরা হয়, তাহলে এ অংশটুকু পিছনের ফেয়েলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। তাই ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

والكتابُ: علمُ الله، واستُعير له الكتاب؛ لأنه ثابتٌ، لا يخالفُ الحق بزيادةٍ ولا نقصانٍ[৪৮].

আরো কিছু আয়াতেও كتاب শব্দটিকে আল্লাহর ইলমের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৯]

---

৪৬ *আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর* ৭/২১৭
ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্বিতীয়তে যে মারজূহ মতটি উল্লেখ করেছেন, আবূস সা'উদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে (২/৪৪৫) তা উল্লেখ করেছেন। জানা নেই– ইমাম আবূস সা'উদের মত একজন মুহাক্কিক কীভাবে কথাটিকে মেনে নিয়েছেন!

৪৭ ***আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*** পৃ. ৩৩

৪৮ ***আত-তাহরীর*** ১১/২১৫

৪৯ সূরা হূদ, আয়াত নং : ৬, সূরা হজ্ব, আয়াত নং : ৬০

***

চিন্তা করে পড়ার একটি বাস্তব নমুনা দেখুন, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে খালদূন (মৃত ৮০৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথায়,

الأخبارُ إذا اعتُمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكَّم أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعةُ العمران، والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيسَ الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب= فربما لم يُؤمن فيها من العثور، ومزلةِ القدم والحيدِ عن جادة الصدق.

وهذا كما نقل المسعودي، وكثيرٌ من المؤرخين في جيوش بني إسرائيل، وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه، بعد أن أجاز مَن يطيق حمل السلاح، خاصة من ابن عشرين فما فوقها، فكانوا ستمئة ألفٍ أو يزيدون.

ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام، واتساعهما لهذا العدد من الجيوش.

ولقد كان مُلك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل بكثيرٍ، وكانت ممالكهم بالعراقين، وخراسان، وما وراء النهر والأبواب أوسع من ممالك بني إسرائيل بكثير، ومع ذلك لم يبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبًا منه.

وأيضًا: فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملكهم، وانفسح مدى دولتهم، والقوم لم تتسع ممالكهم إلى غير الأردن وفلسطين من الشام، وبلادِ يثرب وخيبر من الحجاز.

وأيضًا: فالذي بين موسى وإسرائيل عليهما السلام إنما هو أربعة آباء، والمدة بينهما على ما نقله المسعودي مئتانِ وعشرون سنةً، ويبعدُ أن يتشعَّب النسل في أربعة أجيالٍ إلى مثل هذا العدد.

'ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে শুধু বর্ণনার উপর নির্ভর করা পদস্খলনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে উচিত হল– মানুষের অভ্যাস, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, পৃথিবীর স্বভাব-নীতি এবং মানব-সমাজের অবস্থাকে বিচারকের ভূমিকায় রাখা।

সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানকে অতীতের উপর এবং অতীতকে বর্তমানের উপর কেয়াস করা।

মাসউদীসহ অনেক ইতিহাসবিদ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে থাকা বনী ইসরাঈলের বাহিনী-সংখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, তারা ছিল ছয় লাখ, কিংবা তার চেয়েও বেশি। বিশ বা বিশ-উর্ধ্ব যারা অস্ত্র ধারণ করতে পারে এ সংখ্যা তাদেরই।

অথচ লক্ষ্য করা হচ্ছে না– সেসময় মিশর ও শামের ভৌগলিক অবস্থান কি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, বনী ইসরাঈলের বাহিনী সংখ্যা ছয় লক্ষ হতে পারে?

পারস্য সাম্রাজ্য বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য থেকে অনেক বড় ছিল। ইরাক, খোরাসান, মাওয়ারাআন্নাহার ও আবওয়াবের সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিল পারসিকদের সাম্রাজ্য। পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কেও তো এত বিরাট সংখ্যা উল্লেখ করা হয় না। বরং এর কাছাকাছিও পাওয়া যায় না। কাদেসিয়ায় তাদের সৈন্য-সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। তাও তাদের খাদেম ও চাকর-নওকরসহ এ সংখ্যা। মূল সৈন্যের সংখ্যা হযরত আয়েশা ও যুহরীর বর্ণনা অনুযায়ী ষাট হাজার!

তাছাড়া বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য তো কেবল হেজাযের খায়বার ও ইয়াসরিব এবং শামের জর্ডান ও ফিলিস্তিনের সংকীর্ণ অঞ্চল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। যদি তাদের সৈন্য-সংখ্যা এতটাই বেশি হতো তাহলে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আরও অনেক বেশি হওয়ার কথা ছিল।

হযরত মূসা ও হযরত ইয়াকুব (আলাইহিমাস সালাম)-এর মাঝে মাত্র চার পুরুষ। মাসউদীর বর্ণনা অনুযায়ী সময় ছিল মাত্র ২২০ বছর। হযরত ইয়াকুব যখন মিসরে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল ৭০জন। তাহলে মাত্র চার প্রজন্মে বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ছয় লক্ষ হওয়া কি সম্ভব?!'[৫০]

দেখুন, ইতিহাসকে কিভাবে কত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসকে এভাবে বিশ্লেষণ করার মানুষ খুবই কম। শেষ যুগের হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী (মৃত ১৩৭৫ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাদেরই একজন। তাঁর রচিত *সাওয়ানেহে কাসেমী* পড়ে দেখা যেতে পারে।

---

৫০ *মুকাদ্দিমাতু ইবনে খালদূন* পৃ. ১৭-১৮
এখানে সম্পূর্ণই ভাব তরজমা করা হয়েছে। এমন বাক্যের তরজমাও এসেছে যা এখানে নকল করা হয় নি।

এভাবে ভেবে ভেবে প্রতিটি বিষয় পড়ুন। পড়া অল্প হবে। কিন্তু আপনি সফলকাম হবেন ইনশা-আল্লাহ।

❁❁❁

ইশকাল-আপত্তি বুঝে ও হল্ করে পড়ুন

একটা সময় ছিল, যখন তালিবে ইলমরা সবকের মধ্যেই উস্তাদদের কাছে ইশকাল-আপত্তি তুলে ধরতো। উস্তাদরাও ছাত্রদের ইশকাল-আপত্তির জবাব দিতেন খোলা মনে। ইলম এখন উভয় দিক থেকেই বড় যুলুমের শিকার। তালিবে ইলম ভাইয়েরা মোটেও মুতালা'আ করেন না। ইশকাল তো দূরের কথা, মূল কিতাবই তাদের বুঝে আসে না! তাহলে ইলম পাকাপোক্ত হবে কিভাবে?

দারুল উলূম দেওবন্দে ***মীর যাহেদ*** কিতাব পড়াতে গিয়ে এক উস্তাদ ছাত্রদের পক্ষ থেকে এত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, যা তার জন্য রীতিমত হয়রানির কারণ হয়েছে। তাই হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই সময়ের যুবক শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতী শফী' রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে বললেন, 'এ কিতাব পড়ানোর যিম্মাদারী তুমি গ্রহণ কর।'[৫১]

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর বাবা মাওলানা মু'য়াযযম শাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) বড় আলেম ছিলেন। ছেলেকে **মুখতাছারুল কুদূরী** পড়ানো শুরু করেছেন। ছেলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ইশকাল-আপত্তি তুলে ধরা শুরু করলো। বাবা হয়রান হয়ে প্রতিদিন ***হেদায়াও*** মুতালা'আ করে আসতেন। তাতেও বিশেষ কাজ হলো না। অবশেষে ভিন্ন একজন শিক্ষকই রাখলেন, যিনি মাওলানা কাশ্মীরীকে শুধু **মুখতাছারুল কুদূরী** পড়াবেন! কিন্তু কয়েকদিন পড়ানোর পর শিক্ষকও হাঁপিয়ে উঠলেন। ইশকাল-আপত্তির মুখে টিকতে না পেরে পড়াবেন না বলে ওযর পেশ করলেন।[৫২]

বড় বড় মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তারা তাঁদের কিতাবে পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমদের কোনো কোনো আলোচনা ও তাহকীক ত্রুটিযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। আপনি যদি চিন্তা-ফিকির ও বুঝ-ফাহ্মের সহিত অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, অন্য আলিমের ভুল ধরতে গিয়ে অনেকে নিজেরাই ভুলের শিকার হয়েছেন। এখান থেকে আমরা এ আদবটি শিখবো– আমরা

---

৫১ *মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ* পৃ. ৩৬

৫২ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা মিন নুযূলিল মাসীহ* গ্রন্থের শুরুতে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ভূমিকা। পৃ. ১৪

যা কিছু পড়বো ফিকির ও ফাহমের সহিত পড়বো এবং ইশকাল-আপত্তি তুলে তুলে পড়বো। পড়া হবে সামান্য। তবে ফল হবে অসামান্য। (ليتفقهوا في الدين)-এর তাফসীরে মুফতী শফী' রহমাতুল্লাহি আলাইহি কী বলেছেন, তা হয়ত আপনার জানা আছে। তা'আল্লুম উদ্দেশ্য নয়, মাকছাদ হলো তাফাক্কুহ।

হযরত ইমামে 'আযম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিশিষ্ট উস্তাদ হযরত হাম্মাদ বিন আবূ সুলাইমান (মৃত ১২০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ছাত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

كانَ أبو حنيفةَ يُجالسنا بالسمت والوقـار والورع، وكنا نُغذيه بالعلم، حتّى دقّق السـؤال، فخفتُ عليه من ذلك، وكان واللهِ حسن الفهم، جيد الحفظ، حتّى شنعوا عليه بما هو الله أعلمُ به منهم، فيَلْقَون غدًا اللهَ، وأنا أعلمُ أن العلم جليس النعمان، كما أعلم أن النهار له ضوء يجلو ظلمة الليل.

'আবূ হানীফা পূর্ণ আদব, গম্ভীরতা ও তাকওয়ার সহিত আমাদের সঙ্গে উঠাবাসা করতো। আমি তাকে ইলমে সমৃদ্ধ করতাম। সে আমাকে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন করতো। তাই তাঁর ব্যাপারে (মানুষের মূর্খতা ও হিংসা-বিদ্বেষের) আশঙ্কা হতে থাকে। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আবূ হানীফার বুঝ বড় পাকা ও গভীর ছিল। মুখস্থ শক্তি ছিল খুব প্রখর। এক পর্যায়ে লোকেরা তো তাঁর বদনাম রটিয়েই ছাড়ল। আল্লাহই সে সম্পর্কে তাদের থেকে ভাল জানেন। তারা তো কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তবে আমি জানি– ইলম সর্বদাই নুমানের সঙ্গী। যেমন জানি, দিবসের রয়েছে প্রখর আলো। যে আলো রাতের আঁধারকে ভেদ করে সবকিছুকে একপর্যায়ে আলোকিত করেই ছাড়ে।'[৫৩]

আমাদের আকাবির ও সালাফের ইতিহাসে এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি ইশকাল-আপত্তি ও প্রশ্ন তুলে পড়েন নি। বরং অধিক প্রশ্ন তোলা তো আমাদের হানাফী আলেমদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এতে হয়তো কেউ কেউ নাখোশ হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তো তাঁদের চিন্তার সূক্ষ্মতা ও বুঝের গভীরতার কারণে তাঁদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের খেদমত নিয়েছেন এবং দ্বীনকে হেফাযত করেছেন। হাজার বছর পরে কেমন সমস্যা হতে পারে এবং যদি সমস্যা হয়েই যায়

---

৫৩ কাযী আবূ আবদুল্লাহ হুসাইন ছাইমারী (মৃত ৪৩৬ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *আখবারু আবী হানীফা* পৃ. ২৩

তাহলে সমাধান কী হবে, তাও তো ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ বলে গেছেন। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।[৫৪]

আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের অনেকের কাছে ইশকাল-আপত্তি তুলে পড়া 'বেআদবি'। যারা ইশকাল করে তারা লেখকের সঙ্গে ও উস্তাদের শানে বেদআদবি করে– এটাই তাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মোটেও ঠিক নয়।

হ্যাঁ, কোনো উস্তাদ প্রশ্ন করা পছন্দ না করলে তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। আবার কেউ উত্তর দিতে না পারলেও তাঁকে কষ্টে ফেলা উচিত নয়।

একটি নমুনা লক্ষ্য করুন :

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾[৫৫]

আয়াতে উল্লেখিত توصيل-এর অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদী (মৃত ২৩৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,

أتممناه.[৫৬]

সম্ভবত পাঠকের হৃদয়ে ইমাম ইয়াযীদীর কথার উপর প্রশ্ন হচ্ছে। আপনি ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন উযাইর (মৃত ৩৩০ হি.-এর দিকে[৫৭]) লিখিত ***গরীবুল কুরআন***, আবূ ওমর গুলামু ছা'লাব (মৃত ৩৪৫ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত ***ইয়াকুতাতুস সিরাত্ব***, ইমাম রাগেব আসফাহানী লিখিত ***মুফরদাত***, সামীন হালাবী আহমদ বিন ইউসুফ (মৃত ৭৫৬ হি.) রচিত ***উমদাতুল হুফ্ফায***, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীরে ছন'আনী (মৃত ১১৮২ হি.) লিখিত ***তাফসীরু গরীবিল কুরআন***– এ-

---

৫৪ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে আল্লামা যাহেদ কাউসারীর ***ফিকহু আহলিল 'ইরাক*** ও হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)-এর ***ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস***। আরও বিস্তারিত দেখা যেতে পারে লেখক রচিত ***আল-মাকাছিদুশ শারীফা***-এর ভূমিকায়।

৫৫ সূরাতুল ক্বছাছ, আয়াত নং : ৫১

৫৬ ইয়াযীদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত ***গরীবুল কুরআন ওয়া-তাফসীরু*** পৃ. ২৯২
ইমাম আখফাশ ও আবূ উবাইদা থেকে আল্লামা কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) এমনটিই নকল করেছেন। ***আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*** ৭/২৬২

৫৭ তাঁর মৃত্যুসন ও নামের তাহকীকের জন্য দেখুন হাফেয যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*** (৯/৪২৮-৪২৯)। অনেকে তাঁর বাবার নাম বলেছেন 'উযাইয'। সহীহ হল 'উযাইর'।

সবগুলো গ্রন্থ ঘেঁটে দেখুন, আপনি ইমাম ইয়াযীদীর উল্লেখিত অর্থটি কোথাও পাবেন না। তখন আপনার ইশকাল আরো মজবুত হবে। এরপর যদি তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবাদি দেখেন, ইশকাল মজবুততর হবে।[৫৮]

এটা আপনার ইশকাল হওয়ার সূরত। প্রিয় তালিবে ইলম ভাই অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন– ইশকালের বিশেষ একটি পদ্ধতির জন্য পূর্বে কিছু জানা থাকতে হবে এবং একই ফনের অন্যান্য কিতাব ঘাঁটতে হবে। কিতাবের শরাহ ও হাশিয়া থাকলে তা দিয়েও কখনো ইশকাল পয়দা হতে পারে।

এবার আপনার ফায়সালার পালা। হয়ত আপনি বলবেন– ইমাম ইয়াযীদীর অর্থ সঠিক। তবে তার ব্যাখ্যা এই এই। কিংবা বলবেন, তাঁর অর্থ সঠিক নয়।

توصيل-এর মূল মাদ্দাহ হল– و ص ও ل। এর মূল অর্থ হল, একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর সঙ্গে মেলানো। একটি কথাকে যদি আরেকটি কথার সঙ্গে মেলানো হয়, ফলাফল হয় দু'টি–

এক. কথাটি বিস্তারিত ও ব্যাখ্যাপূর্ণ হয়।
দুই. কথাটি তার পূর্ণতায় পৌঁছায়।

এ দু'টি হল ফলস্বরূপ অর্থ। নতীজা দিয়ে শব্দের অর্থ করা– আরবীভাষার প্রসিদ্ধ নীতি। অভিধানগুলো সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করলেই বিষয়টি আপনি বুঝতে পারবেন।[৫৯]

---

৫৮ ***আল-কাশশাফ*** (৩/৩৮৬), ***মাফাতীহুল গাইব*** (১২/৪৯৫) এবং ***ইরশাদুল আকলিস সালীম*** (৫/১৩৫)।

৫৯ ইমাম আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী (মৃত ৫৪৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

«قوله تعالى: ﴿وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ﴾، يعني: كفر، ... فإن الفتنة في أصل اللغة: الابتلاء والاختبار، وإنما سُمي الكفر فتنةً؛ لأنّ مآل الابتلاء كان إليه». «أحكام القرآن» (١/١١٣) سورة البقرة، رقم الآية: (١٩٣).

وقال: «قال علماؤنا: قوله تعالى ﴿الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا﴾ كنايةٌ عن استجابةٍ في البيع، وقبضه باليد؛ لأن ذلك إنما يفعله المربي قصدًا لِمَا يأكله، فعبَّر بالأكل عنه، وهو مجازٌ من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وهو أحد قسمي المجاز كما بيناه في غير موضعٍ». انتهى من «أحكامه» (١/٢٣٣).

وقال أيضًا: «لأنه تعالى خاطبَنا بلغة العرب، وهي تعبِّرُ عن الشيء بما يجاوِرُه، أو بما يشتمل عليه». «أحكام القرآن» (١/٥٢) سورة البقرة، رقم الآية: (١٤٤).

বিশেষত, ইমাম ইবনে ফারিস (মৃত ৩৯৫ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত *মাক্বায়ীছুল্লুগাহ*।

এ জন্যই আপনি প্রথম অর্থটি একাধিক অভিধান ও তাফসীরেও পেয়ে যাবেন।

আপনি একটু ভাবুন– ইমাম ইয়াযীদীর লিখিত অর্থ যদি আপনার-আমার মত মিসকীন তালিবে ইলমের কাছে মুশকিল মনে হয়, তাহলে তাঁর মত একজন ইমাম এত সাধারণ একটা ভুল কিভাবে করতে পারেন?! এটা কি অসম্ভব মনে হয় না? তিনি কিতাব লিখে আমাদের যামানার মতো ছেপে দেন নি। তিনি তাঁর শাগদেরদের কিতাবটি পড়িয়েছেন। অর্থটি যদি ভুল হতো, শাগরেদরাও তো ইশকাল করার কথা ছিল।

এবার আপনি ইমাম ইবনে মালাক (মৃত ৮২১ হিজরীর পর) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি 'ইবারত দেখুন। তিনি বলেছেন,

لأنَّ الاعتبارَ ردُّ الشيء إلى نظيره. كذا قاله ثعلبٌ رحمه الله، من كبار أئمة اللغة.[৬০]

এ কথার উপর শায়খ রুহাবী (মৃত ৯৪২ এর পর) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইশকাল লক্ষ্য করুন,

قوله «كذا قاله ثعلبٌ»، قلتُ: وقال غيرُه: الاعتبارُ الاتِّعاظُ، بل هو الأسبق إلى الفهم هنا.

হযরত রুহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দু'টি অর্থকে পরস্পর বিরোধী মনে করে একটিকে তারজীহ ও প্রাধান্য দিয়েছেন। বাস্তবে এখানে কোনো বিরোধ নেই।

পিছনের কথাটুকু বুঝতে পারলে হাফেয ইবনে হায্ম যাহেরী (মৃত ৪৫৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথার ওযন বুঝতে পারবেন। তিনি বলেন,

فإنْ قالوا: إنَّ القول بالقياسِ في القرآنِ، وذكروا قوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوْا يَاُوْلِي الْأَبْصَارِ﴾، وجزاء الصيد، وكذلك الجروح.[৬১]

---

৬০ *শারহুল মানার* ৩/১৩৫৭

قلنا لهم: ليس معنى (اعتبروا) في لغة العرب: قيسوا، ولا عرف ذلك أحدٌ من أهل اللغة، وإنما معنى (اعتبروا): تعجبوا واتَّعظوا.(৬২)

যে কোনো কথা পড়ার পর থেমে যান। কথাটি নিয়ে ভেবে সামনে বাড়ুন। ভাবলে দেখবেন– অনেক সোজা কথায়ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা লুকায়িত থাকে। সেসব ফায়েদা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আপনাকে ভাবতে হবে।

***

কুরআন মাজীদ থেকে আরেকটি উদাহরণ দেখুন :

﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾(৬৩)

আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন– এখানে তো সাধারণত (على) হরফুল জরটি ব্যবহৃত হওয়ার কথা। তাহলে (في) ব্যবহার করা হল কেন? সহজ উত্তর কোথাও এমন পেয়ে যাবেন, (في) এখানে (على)-এর অর্থে।(৬৪) কিন্তু বাস্তব উত্তর দেখুন আল্লামা যামাখশারী (মৃত ৫৩৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্যে। তিনি বলেন,

---

৬১ ইবনে হায্ম যাহেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ব্যাপ্ত জ্ঞানের কারণে আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। শিকারের প্রতিদান বলে তিনি সূরা মায়িদার ৯৫ নং আয়াতের দিকে ইশারা করেছেন। আর আঘাতের প্রতিদান বলে তিনি সূরা মায়িদার ৪৫ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর রায়ের সঙ্গে একমত না হলেও কিভাবে তাঁর জ্ঞানকে অস্বীকার করা যায়– বলুন?

৬২ ***আন-নুবায ফী উসূলিল ফিকহীয যাহিরী*** পৃ. ৫১৭ (***আল-ফিকহু ওয়া উসূলুল ফিকহি*** শিরোনামে আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিভিন্ন রিসালা ও মুহাক্কাক কিতাবের সাথে তাঁরই তাহকীকে ছাপা)।

৬৩ সূরা ত্বহা, আয়াত নং ঃ ৭১

৬৪ আশ্চর্যের বিষয় হল, আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মুহাক্কিকুল কুরআনও এমন কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

واللامُ في قوله تعالى ﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ بمعنى (إلى) مثل اللام في قوله تعالى ﴿كُلٌّ يَجْرِىْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، ألا ترى نظيره في سورة لقمان ﴿كُلٌّ يَجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ بحرف (إلى)؟

انتهى من كتابه «تحقيقات وأنظارٌ في القرآن والسنة» ص١٧٩.

وعلَّقَ المؤلف على نسخته الذاتية لهذا الكتاب: إنما يدومُ للرجل مملوكُه، واللامُ تفيد الملك، فكأن هذه المخلوقات لتسخير الله تعالى إياها على جريها ملكتْ هذا المستقر، فلا هي تعدلُ عنه، ولا الله يصرفها عنه إلى أجلٍ مسمى. وهذا المعنى مفقودٌ في (إلى).

(في): وفي معناها الظرفيةُ، كقولك: زيد في أرضه، والركض في الميدان، ومنه: نظر في الكتاب، وسعى في الحاجة.

وقولُهم في قول الله عز وجل ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ﴾: إنّها بمعنى (على): عملٌ على الظاهر، والحقيقةُ أنها على أصلها؛ لتمكن المصلوب في الجذع تمكنَ الكائن في الظرف فيه.[৬৫]

অর্থাৎ ফিরআউনের বক্তব্যে (في) হরফটি এ কথা বোঝাচ্ছে– সে যাদুকরদেরকে এমনভাবে শুলে চড়াতে চায়, তারা কোনোভাবে তা থেকে রেহাই পাবে না। যরফ যেমন মাযরূফকে ঢেকে নেয়, তেমনি তাদেরকেও যেন শুলি ঢেকে নিবে। তারা কোনোভাবেই তা থেকে ছুটতে পারবে না।

وأفادتْ (إلى) في آية لقمان أنّ اللام في آية الفاطر والزمر تضمَّنتْ معنى (إلى). تاريخ التعليقِ: ١٤٤٢/٣/٢٢هـ.

ثمَّ رأيتُ للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافيِ (م ٤٣١ هـ) رحمه الله تعالى فائدةً بديعة رائعةً حول هذا الإشكال في كتابه العجاب، الذي لـم نعلم له نظيرًا، المسمَّى بـ«درة التنزيل وغرة التأويل» ص٢٥٧-٢٥٨ (ضمن تأويل سورة لقمان)، فلولا طولُها لنقلتُها برمتها.

وقال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: «عادةُ العرب أن تُحَمِّل معاني الأفعال على الأفعال؛ لـما بينهما من الارتباط والاتصال، وجهلتْ النحوية هذا، فقال كثيرٌ منهم: إن حروف الجر يبدلُ بعضها من بعضٍ، ويحمل بعضُها معاني البعض، فخفي عليهم وضعُ فعل مكان فعلٍ، وهو أوسع وأقيس، ولجُوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيقُ فيها نطاق الكلام والاحتمال». انتهى من كتابه النفاع المفقَّه العجاب «أحكام القرآن» (١٧٦/١).

[৬৫] *আল-মুফাসসাল ফী ছন'আতিল ই'রাব* পৃ. ২৪০
এ ফায়েদাটি দেখেই মূলত এ অমূল্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেছিলাম। এর পর দেখলাম– এ ছোট্ট কিতাবটিতে এ ধরণের আরও বহু মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে। *হেদায়াতুন্নাহু* ও *কাফিয়া* মুখস্থ করে ফেললেও আমরা এ কিতাব থেকে বেনিয়ায নই। একসময় আমাদের উলামায়ে কেরাম কিতাবটিকে পাঠ্যসূচির মধ্যে রেখেছিলেন, যেমনটি আল্লামা মাহমূদ কাফাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর *কাতাইব* গ্রন্থে বলেছেন।

এটি আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাইদের কাছে নমুনা হিসেবে পেশ করা হল। কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করলে আপনারা এমন অনেক হরফ পাবেন, যেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশ্ন হবে– এখানে তো এটা না হয়ে ওটা হওয়ার কথা ছিল। কেউ যদি বলেন, এই হরফটি ঐ হরফের অর্থে, আপনি শান্ত হয়ে যাবেন না। বরং আপনি নিজে তালাশ করুন এবং চিন্তা করুন। কুরআন মাজীদের হরফের এই অধ্যায়টি যদি আপনি বুঝতে পারেন, কুরআনের 'ইজায ও অলৌকিকতা বোঝায় অনেক দূর এগিয়ে যাবেন, ইনশা-আল্লাহ।

❁❁❁

'চারপাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মেজাজ ও রুচি একদিকে যেমন মানুষের চিন্তানৈতিক অগ্রগতিকে তরান্বিত করে, তেমনি মানসিক অবসাদ থেকে তাকে দেয় নিস্তার, প্রতিভাজগৎকে দেয় বিস্তার।'

সফলতার পাঠশালা পৃ. ১১

কিতাবকে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন

কিছু তো আছে ইলমী কায়দা। সেগুলো ইলমী পরিভাষার আলোকেই বুঝতে হবে। সমাজ থেকে বোঝার বিষয় নয়। কিন্তু অনেক বিষয় এমন আছে, যেগুলো ইলমী কায়দা হওয়ার পরও আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই সেগুলো আমাদের সামাজিক উদাহরণ থেকে বুঝতে হবে। অথবা জটিল হওয়ার কারণে কম বুঝের কারণে কারো ইশকাল হতে পারে। তখন সমাজ থেকে এর উদাহরণ বের করে বুঝতে হবে।

উসূলুল ফিকহ যখন আমরা ***উসূলুশ শাশী*** কিতাবে পড়ি, অনেক কিছুই বাস্তবতার আলোকে বুঝি না। তাই খাস, 'আম, মুশতারাক ইত্যাদির কোনো উদাহরণ আমরা সমাজ থেকে বের করতে পারি না।

আমাদের ইলমী পরিবেশ থেকে মুশকিল ও মুজমালের একটি উদাহরণ দেখুন–

আপনার উসতাদ বললেন, 'আরও দেড়শ' বছর পূর্বে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন এমন ফতোয়া দিয়েছেন।'

আমরা জানি– রশীদ আহমাদ নামে আমাদের উপমহাদেশে বিখ্যাত মুফতী ছিলেন দু'জন। একজন হযরত গাঙ্গুহী, আরেকজন হযরত লুদইয়ানুবী, **আহসানুল ফাতাওয়ার** লেখক। কথাটিতে 'দেড়শ' বছর' বাক্যটি নিয়ে ভাবলে দেখতে পাবেন– উদ্দেশ্য হল হযরত গাঙ্গুহী। কারণ, তিনি ইন্তেকাল করেছেন ১৩২৩ হিজরীতে। আর হযরত লুদইয়ানুবীর ওফাতের পর এখনো ৫০ বছর পূর্ণ হয় নি।

উলূমুল হাদীসে এই ফাহম খুবই কাজে আসে। একই নামে প্রচুর বর্ণনাকারী পাওয়া যায়। বিশেষত যদি একই নামের উভয়জন এক শায়খের ছাত্র হিসেবে মাশহূর হোন, তাহলে ভুলের আশঙ্কা থাকে অনেক বেশি। উলূমুল হাদীসকে সামনে রেখে এ বিষয়ে অন্য কোথাও আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো। আল্লাহই তাওফীদাতা।

লক্ষ্য করুন, উদাহরণটিতে এমন করীনা রয়েছে, যা দিয়ে মুবহামকে ব্যাখ্যা করে নেয়া যায়। এটাকেই আমরা বলি 'মুশকিল'।

এভাবেই অন্যান্য পরিভাষাগুলোও নিজেদের সমাজ থেকে বুঝে নিন।

ইসলামী শরীয়তের নস্খের বিষয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছে। সমাজ থেকে নসখের বিষয়টি বোঝানোর জন্য হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

'রোগীর বর্তমান অবস্থা দেখে ডাক্তার এক প্রকার ঔষধ নির্ধারণ করে দেন। ডাক্তার খুব ভালো করেই জানেন– দু'চার দিন পর রোগীর অবস্থা পরিবর্তন হবে। তখন রোগীকে ভিন্ন ঔষধ দিতে হবে। এ-সব কিছু জেনেও ডাক্তার প্রথম দিন শুধু প্রথম দিনের উপযোগী ঔষধই দেন। দু'দিন পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ঔষধ পরিবর্তন করেন।

বিজ্ঞ চিকিৎসক চাইলে এও করতে পারেন– প্রথম দিনই পূর্ণ চিকিৎসার বিবরণ লিখে দিবেন। বলে দিবেন, দু'দিন অমুক ঔষধ। তিন দিন এটা। আর এক সপ্তাহ সেটা। কিন্তু এভাবে বিস্তারিত বলে দিলে রোগীর মেধায় মারাত্মক চাপ পড়বে। এতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। এজন্য ধীরে ধীরে তিনি ঔষধ পরিবর্তন করেন। রোগীকে বিস্তারিত একসঙ্গে বলে দেন না।'(৬৬)

সমাজের সঙ্গে কিতাবকে মিলিয়ে পড়ার আরেকটি দিক হল– কিতাবের মাসায়েলকে ইল্লতসহ গভীরভাবে বোঝা।(৬৭) যাতে উক্ত মাসআলার আলোকে সমাজে নব সৃষ্ট মাসায়েলের সমাধান আপনি দিতে পারেন। পরবর্তী কোনো কিতাবে লেখা থাকলেও প্রকৃত অর্থে ইলম অর্জন করতে হলে আপনাকে এটা করতে হবে।

আপনাকে প্রশ্ন করা হল– বিমানে নামায জায়েয হবে কি?

এর উত্তর খোঁজার জন্য আমরা প্রথমেই তালাশ করতে থাকি পরবর্তীদের লেখা ফতোয়ার কিতাব। এই পদ্ধতিটা সহীহ নয়। পরবর্তীরা তো পূর্ববর্তীদের ফিকহের

---

৬৬ *মা'আরিফুল কুরআন* ১/২৮৩
মা'আরিফুল কুরআন (হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী [মৃত ১৩৯৪ হি.] রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। ১/২৩৫
নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরানী সোহবতের পরও শরীয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আহকাম নাযিল হয়েছে অনেক পর। এ থেকেই অনুমান করা যায়– জাহেলী যামানায় মানুষ নিকৃষ্টতার কতটা গভীরে ডুবে ছিল। এমতবস্থায় বিধান ধীরে ধীরে কঠিনতার দিকে ধাবিত হওয়াই তো যুক্তিসঙ্গত ও হিমকমের দাবি।

৬৭ আমাদের দেশের মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর *মুহাযারাতে উলূমুল হাদীস* গ্রন্থটির ১২৯-১৩২ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন। সূক্ষ্ম বুঝ ও বিস্তৃত জ্ঞানের বিবেচনায় আমাদের জানা মতে এ গ্রন্থের কোনো নমুনা ভারত-বর্ষের উলামায়ে কেরামের কাছে নেই। ফিকহ-ফাহম অর্জন করতে চাইলে এ কিতাব পড়ুন এবং বারবার পড়ুন।

কিতাবকে সামনে রেখেই ফতোয়ার কিতাব লিখেছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন। আর পূর্ববর্তী ইমামগণ তো তাঁদের কিতাবগুলো কুরআন-সুন্নাহকে সামনে রেখেই লিখেছেন। তাই আমি প্রথমে খুঁজবো পূর্ববর্তী ইমামগণের কিতাবে।[৬৮]

আপনি ফিকহের একাধিক মুখতাসার গ্রন্থে পেয়ে যাবেন– কাবা শরীফের উপরে এবং কাবা থেকে উঁচু কোনো কিছুতে নামায পড়া বৈধ।[৬৯] তার অর্থ হল, কিবলা শুধু কাবার কায়া বরাবর নয়; বরং আসমান পর্যন্ত। কাবার উপর বা পাহাড়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেসময়ের অবস্থার বিবেচনায়। তাই বিমানের আরোহীও বিমানে নামায পড়তে পারবে।

এবার আপনি এর আলোকেই হল্ করুন– ইতেকাফকারী মসজিদের ছাদে গেলে কি তার ইতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে? মসজিদের ছাদের উপর আদৌ টাওয়ার বসানো জায়েয হবে? মুজাহিদে 'আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেন বাইতুল মুকার্‌রমের নিচ তলাকে মার্কেট আর উপর তলাকে মসজিদ বানাতে বলেছেন, বুঝতে পেরেছেন?

বর্তমান যামানায় এমন কিছু গাড়ি বের হয়েছে, যেগুলোতে মিটারের সাহায্যে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। এসব গাড়িতে ভাড়া ও পথের দূরত্ব নির্ধারণ না করে চড়ার হুকুম কী? আপনাকে প্রশ্ন করা হল।

'ছামান' ও 'মাসাফাত'-এর জাহালাতের কারণে ঝগড়ার আশঙ্কা থাকে এবং হয়ও। রিক্সা-চালকদের সঙ্গে অহরহ রাস্তা-ঘাটে বিভিন্ন ভাইয়েরা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। আপনি যদি বাহ্যিক দিকে তাকান, মাসআলার মানাত্ব ও মূল কারণ না বুঝেন, তাহলে বলে দিবেন– এমন গাড়িতে চড়া ঠিক নয়। অথচ মিটারের নির্ধারণে চালক ও যাত্রী

---

৬৮ এর অর্থ মোটেও এ নয়– ফতোয়ার জন্য পরবর্তী উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার কিতাব দেখা নিষেধ। বরং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের কিতাব সঠিক অর্থে বুঝতে হলে তো পরবর্তীদের কিতাব দেখতেই হবে। বুঝমান সাথীদের প্রথমে উচিত– মাসআলা সামনে আসার পর নিজের পক্ষ থেকে এর সমাধান বের করা। কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া কোনো কিতাবের সাহায্য না নেয়া। এর পর পূর্ববর্তী ইমামগণের কিতাব মুরাজা'আত করা। মুকারানা করে দেখা, আমরা যা বুঝলাম তারাও কি এমনি বুঝেছিলেন? আমাদের বুঝ তাদের বুঝের সঙ্গে না মিললে কারণ খুঁজতে হবে। কখনো তো স্পষ্টই ভুল হবে। আবার কখনো ইমামগণের মারজূহ মতের সঙ্গে মিলবে। আবার কখনো একাধিক মতের একটি সঙ্গে মিলবে। নিজের বুঝ প্রখর করার জন্যই এ পদ্ধতি। নিজেকে মুজতাহিদ বানানোর জন্য নয়। মুজতাহিদ ইমামগণের কথা তাঁদের মত করে বোঝার লোক তো তাঁদের যামানায়ও কম ছিল! তাহলে এখন?!

৬৯ দেখুন, *মুখতাসারুল কুদূরী* (৪৬), *আল-মুখতার* (তার শরাহ *আল-ইখতিয়ার*-এর সঙ্গে ১/১৫২), *কানযুদ দাকাইক* (তার শরাহ *তাবয়ীনুল হাকায়েক* ১/৫৯৭ এবং *আল-বাহরুর রায়েক*-এর সঙ্গে ২/৩৫০-৩৫১) ইত্যাদি।

উভয়ে একমত হওয়ায় এই আশঙ্কা থাকে না। তাই পথের দূরত্ব ও ভাড়া অনির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও এই চুক্তি জায়েয।[৭০]

আপনাকে প্রশ্ন করা হল– মোবাইলে একজন বিদেশ থেকে কথা বলছে এবং তার চেহারাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে যদি বিদেশে থেকে ঈজাব করে, আর মহিলা এখানে থেকে কবুল বলে তাহলে কি বিবাহ হবে?

ফুকাহায়ে কেরাম শর্ত করেছেন– সাক্ষীরা উভয়ের কথা একই মজলিসে শুনতে হবে। আপনি যদি বুঝে থাকেন, মোবাইলের মাধ্যমে দূরত্বের কারণে এক মজলিস হবে না, তাহলে বিবাহও হবে না। আর যদি মজলিস হওয়াটাই আপনার বুঝে আসে, তাহলে বিবাহ হয়ে যাবে। কারণ, একই মজলিস বলতে আপনি বুঝেন– সাক্ষীরা একই স্থানে উপস্থিত হওয়া। এর জন্য তো এটা জরুরী নয় যে, স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই ওই মজলিসে থাকতে হবে। মেয়েদের বেলায় তো সাধারণত অন্য কামরা থেকে ওকীল এসেই তাদের সম্মতি জানায়। তথাপি যাকে ফোনে সরাসরি দেখা যাচ্ছে তাকে 'হুকমান' এ মজলিসের অন্তর্ভুক্ত ধরতে বাঁধা কোথায়? বিশেষত যখন তার পক্ষ থেকে কোনো ওকীল উপস্থিত থাকবে, তখন তো বিবাহ সহীহ হতে তো কোনো বাঁধা নেই।

আপনি বিজ্ঞ মুফতী না হলে সমাধান দিবেন না। কিন্তু তামরীন করতে তো কোনো সমস্যা নেই। কারণ, মুফতী শুধু তাফাক্কুহের দৃষ্টিকোণ থেকেই ফতোয়া দেন না। তার ভিন্ন কিছু নীতিও রয়েছে।[৭১]

কিতাবের মধ্যে অনেক সময় প্রাচীন কিছু পড়বেন, যেগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই। যেমন বিভিন্ন ফিরকার আকীদা, গোলাম-বাঁদির মাসআলা। যারা ইসলামী ফিকহের তালিবুল ইলম তাদেরও এ অভিজ্ঞতা রয়েছে– এসব এখনও পড়া জরুরী। বরং অনেক ক্ষেত্রে তো জরুরত আরও বেশি। কারণ, এগুলো পড়েই সমকালীন অনেক মাসআলা আমাদেরকে হল্ করতে হয়।

আপনি যখন পূর্ব-যুগের ফিরাকে বাতেলার আকীদা পড়বেন এবং তাদের ব্যাপারে আমাদের ফুকাহায়ে উম্মতের ফায়সালাও পড়বেন, একটি বিষয় সর্বোচ্চ ফিকির ও ফাহমের সঙ্গে অধ্যয়ন করবেন। সেটা হল– তাদের গোমরাহী মূল কারণ কী? কুফুরির

---

৭০ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) রচিত **উলূমুল কুরআন** পৃ. ৪৫৪

৭১ মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাশায়েখে কেরামের উপর ইশকাল করেছেন। কারণ, তাঁরা তাকবীরে তাশরীকের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছাহিবাইনের মত অনুসারে ফতোয়া প্রদান করেছেন। দলিল হিসেবে তিনি বলেছেন, ইমাম ছাহেবের দলিল অধিক মযবূত। মূলত মাশায়েখে কেরাম তাঁদের সময়ে মানুষের তা'আমুলের দিকে লক্ষ্য করেই এ ফতোয়া দিয়েছেন।

মূল মানাত্ব কী? এটাই আপনার সামনে গণতন্ত্রের হাকীকত তুলে ধরবে। পুঁজিবাদের ধোঁকাবাজি সুস্পষ্ট করে দিবে। সমাজতন্ত্রের পর্দা সরিয়ে দিবে।

আপনি যখন হাদীস শরীফে পড়লেন, 'সরকারী পদ যারা চায় কিছুতেই আমরা তাদের সাহায্য গ্রহণ করি না'[৭২] থেমে যান। ভালোভাবে বুঝে সামনে বাড়ুন। ইতিহাসের পাতা উল্টান। সমাজের বাস্তবতা দেখুন। পদের লালসায় এবং সুনাম-সুখ্যাতির লোলুপতায় যারা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, পৃথিবীবাসীর সঙ্গে তারা কী ঘৃণ্য আচরণ করেছিল! আর যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল ক্ষমতার দাপটে ফেটে পড়া মসনদে বসতে, তারা পৃথিবীবাসীকে কী উপহার দিয়েছিলেন! তাদের শাসন মানুষের উপর বর্ষণ করেছে শান্তির বারিধারা। আর যারা পদ ও ক্ষমতা চায়? বন্ধু ও শত্রু তাদের কাছে সমান হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই ধড় থেকে আলাদা করে দেয় জীবনের চেয়ে প্রিয় সন্তানের কল্লা! বাবা, চাচা ও ভাইদের হত্যায় মেতে উঠার ইতিহাস কি কম?!

সরকারী কোনো পদ কামনা না করা– ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। আমরা এ হাদীস থেকে এটা বুঝতে পারি। তাহলে গণতন্ত্র আমাদেরকে কী শিখাচ্ছে?! ইসলামের গলায় ছুরি বসিয়েছে! আমরাও তাকে দাওয়াত দিচ্ছি, ইস্তিকবাল করছি!!

উলূমুল হাদীসে আমরা পড়ি– একটি হাদীস যদি ইমাম সুফিয়ান সাওরী তাঁর উস্তাদ আবূ ইসহাক থেকে একরকম বর্ণনা করেন। আর ইসরাঈল বিন ইউনুস তার দাদা (আবূ ইসহাক) থেকে একই হাদীস ভিন্নরকম রেওয়ায়েত করেন, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হযরত সাওরীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন।

আরও পড়ি, হযরত আলক্বামা, আসওয়াদ, শুরাইহ, মাসরূক, ইবরাহীম নাখাঈ', সাঈদ বিন মুসায়্যিব, উরওয়া বিন যুবাইর, সালেম বিন আবদুল্লাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ বিন সীরীন, আতা বিন আবী রাবাহ, মাকহূল, ইবনে শিহাব যুহরী, আইউব সাখতিয়ানী, ইয়াহইয়া আনসারী, ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর, সুলাইমান আল-আ'মাশ, (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)– এসব তাবেয়ীগণ যদি কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে হাদীসটি মুতাওয়াতিরের মধ্যে গণ্য হবে। অথচ তাঁদের সংখ্যা মাত্র সতেরজন! এমন রাবীও আছে যাদের মত বিশজন বর্ণনা করলেও হাদীস মুতাওয়াতিরের ধারে-কাছেও যাবে না!

ইল্লত কী? মানাত্ব কী? জ্ঞান ও গুণের কারণে একই কথা দু'জন মানুষ বললে কথার ওযন ভিন্ন হয়। আমাদের সমাজেও আমরা এ নীতি মেনে চলি। কিন্তু গণতন্ত্র

---

৭২ *সুনানে নাসাঈ* ১/৫ এবং (মুআস্সাসাতুর রিসালার ছাপা) পৃ ১২৫-১২৬, হাদীস নং ৪

আমাদের কী শিক্ষা দিচ্ছে? দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানী মানুষ ও সর্বনিম্ন ইতর শ্রেণীর মানুষের সাক্ষ্যের মাঝে পার্থক্য থাকলো কোথায়?

আপনি ক্বদীম মাসায়েল না পড়লে সেক্ষেত্রে ইসলামের মেজাজ বুঝবেন কী করে? শত্রুরা কিছু বললেই তো ঘাবড়ে যাবেন! নতুন কিছু শুনলেই তা যেমন চিন্তা ছাড়া ছুঁড়ে মারবেন না, তেমনি যথেষ্ট না ভেবে গ্রহণও করবেন না। 'ক্বদীম মাসায়েল পড়ে কী লাভ?'– এ চিন্তা যখন আমরা শুনি, আকৃষ্ট হই। চিন্তা ছাড়াই গ্রহণ করে ফেলি।

আপনি কুরআন মাজীদের তাফসীর চিন্তা ও বুঝের সঙ্গে পড়ে থাকলে জানবেন– কুরআন মাজীদের একটি বিরাট অংশ বোঝার জন্য আরবদের ইতিহাস জানতে হয়। অন্যথায় কুরআনের শব্দ প্রয়োগ ও বাক্যের শৈলী পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয়।

কোনো জ্ঞানী এমন নেই, যিনি বিগত জাতির ইতিহাস পড়াকে অপ্রয়োজনীয় 'বস্তু' মনে করেন। কিন্তু শত আফসোস, আমরা আমাদের ইসলামের শুরুর যুগের মাসায়েলগুলো পড়া আর সময় নষ্ট করাকে একই নিক্তিতে মাপছি। শুধু তাই নয়, যারা এগুলো পড়ছে তাদেরকে পশ্চাদপদ মনে করছি। 'বেফিকির' বলে গালি দিচ্ছি। আল্লাহ যদি আমাদেরকে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন দান করতেন তাহলে এসব ভাবাটাও আমরা গুনাহ মনে করতাম। কিন্তু ফাক্বাহাতের অনুপস্থিতির কারণে এটাকেই আমরা শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত মনে করছি।

'চিন্তার সূর্যালোকে স্নাত হলেই আমরা হতে পারি পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ।'

সফলতার পাঠশালা পৃ. ১৪

ইস্তেম্বাত করে পড়ুন

ইস্তেম্বাত ও ইস্তেখরাজ ব্যতিত কেউ তো আলিম হতে পারবে না। যদি ইস্তেম্বাত না হতো, শরীয়াতে মুহাম্মাদী কখনো চিরস্থায়ী হতে পারতো না। তাই শরীয়তে মুস্তাম্বিতীনের গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক বেশি। প্রকৃত অর্থে তাঁরাই ছড়িয়েছেন হেরার দ্যুতি ও মুহাম্মাদী দীপক। তাঁরাই ছিলেন ইসলামী চৈতন্যের প্রধান রূপকার; কথায় ও কর্মে।

ইস্তেম্বাতের পদ্ধতি হল– আমরা একটি তথ্য পড়ে থেমে যাবো। ভাববো, এ কথা থেকে কী বোঝা যায়? আরো কী কী বোঝা যায়? ইস্তেম্বাতের সময় আমরা অন্য কোনো শরাহ বা ফনের অন্য কোনো কিতাবের মুরাজা'আত করবো না। যদিও ইস্তেম্বাতের একটা প্রকারের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন শরাহ ও গ্রন্থের মুরাজা'আত করতে হবে।

কী কী বিষয় ইস্তেম্বাত করা যায়– উদাহরণের সাহায্যে কিছু বিষয় দেখুন :

- প্রত্যেক লেখকের আকলের বিশেষ কিছু হরকত রয়েছে। কখনো লেখক স্পষ্ট বলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই লেখকরা তা বলেন না। লেখকের কিতাবের একটি বিরাট অংশ পড়ে এটা বুঝে নিতে হয়। লেখকের আকলের হরকত বোঝার একটি আশ্চর্যরকম নমুনা দেখুন :

ড. আবূ মূসা মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ বলেন,

ثُم إنك قد تخرج من الكتاب بعلمٍ جليلٍ، ليس فيه حرفٌ واحدٌ من هذا الكتاب، وإنَّما شغلك منه طريقة تفكير المؤلف، وطريقةُ تناوله لمسائل علمه، وطريقةُ تفتيشه في البحث عن المعرفة، فتخرج أنتَ بهذه الطريقة، وتنقلُها إلى/ علمٍ آخر، فتفتح لك بابًا آخر.

وقد حدَثَ هذا مع الجرَمي، الذي قال: إنه كان يفتي في الفقه من «كتاب سيبويه»، فلم يفهم الناسُ كلامه، وسألوا المبرِّد - وهو عالِمٌ، كما كان يُقال:

هَمُّك من عالمٍ – فقال: إن «كتاب سيبويه» يُعلِّم العقل، فانتفع الجرمي بطريقة سيبويه في مفاتشة اللغة لاستخراج قوانينها، وفاتش الحديث ليستخرج أحكامه.

وهذا من أغربِ وجوه القراءة، فأنت لا تقرأُ الكتاب لتحصيل مادته العلمية، وإنما لتحصيل حركة عقل مصنِّفه، وكأنك ترى في الكتاب علمَيْنِ: علمًا هو العلم الذي نتعلمه ونعلِّمه، وعلمًا آخر، هو طريقة تفكير المصنف، وطريقة/ نظره، وطريقةُ استخراجه، وهو العلم الثاني علمٌ لم ينطق به لسانك، ولا لسان المؤلف، وهو الذي يسكن عقلَك، ويهديك إلى أن تنتج علمًا، وهو العلم المسكوتُ عنه.

'তুমি কখনো একটি কিতাব থেকে অনেক ইলম অর্জন করতে পারো। অথচ তোমার অর্জিত বিষয়ে কিতাবে এক হরফও লেখা নেই! মূলত তোমার লক্ষ্য ছিল– লেখকের চিন্তার পন্থা বোঝা। লেখক কিভাবে তার আলোচ্যবিষয় পেশ করছেন সেটা অনুধাবন করা। কিভাবে তিনি জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে বের করে আনছেন– সেটা জানা।

তুমি লেখক থেকে এই পদ্ধতিটা শিখে এটাকে অন্য ইলমে প্রয়োগ করবে। দেখবে– তোমার সামনে ইলমের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

জারামীর সঙ্গে এ ঘটনাই ঘটেছে। বলা হতো, তিনি সীবাওয়াইহের নাহুর *আল-কিতাব* থেকে ফিকহের ফতোয়া প্রদান করেন। মানুষ তার কথা বুঝতে না পেরে মুবাররিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, "সীবাওয়াইহের কিতাব আকল শেখায়। সীবাওয়াইহ যেভাবে আকলকে ব্যবহার করে ভাষার নিয়ম-কানুন বের করেছেন, তিনি এই তরীকাকে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ফলে তিনি এ তরীকায়ে তাফকীরের মাধ্যমে হাদীস থেকে বিধি-বিধান বের করতে সক্ষম হয়েছেন।"

এ এক অদ্ভুত অধ্যয়ন। তুমি কিতাবের ইলমী তথ্য জানার জন্যই কিতাব পড়ছো না। বরং লেখকের আকলের হরকতটা অর্জন করাই তোমার মূল উদ্দেশ্য। যেন তুমি কিতাবে দু'টি ইলম দেখতে পাচ্ছো– এক, ঐ ইলম যেটা আমরা শিখি-শেখাই। আরেক প্রকার হল লেখকের চিন্তার পদ্ধতি ও ইস্তেম্বাতের

তরীকা। এই দ্বিতীয় ইলম সম্পর্কে না তুমি কিছু পড়েছো। আর না লেখক কিছু লিখেছেন। কিন্তু বাস্তবে এটাই তোমার আকলে থেকে যাবে এবং তোমাকে ইলমের ঝর্ণা উৎসারিত করার পথ দেখাবে, পদ্ধতি শেখাবে।'[৭৩]

আমাদের বর্তমান বাজারে আপনি অনেক মুসলিম লেখকদের কিতাব পাবেন। আফসোস, তাদের অনেকের কিতাবের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা নেই। অথচ এটা সুন্নাতে মুতাওয়ারাসাহ। নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সকল আকাবিরে দ্বীন চিঠি-পত্র ও কিতাব-রচনার ক্ষেত্রে এ সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেকেই হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা মেখে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার উপচে পড়া পাত্র উপুড় করে হামদ ও সালাতও লিখেছেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে।[৭৪]

এর থেকে আপনি একটা বিষয় ইস্তেম্বাত করুন। আমরা আজ সুন্নাতে বড় পিছিয়ে আছি। আরেকটু গভীরে যান– বাহ্যিক উন্নতিতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আত্মিক উন্নতি ও ঈমানী জযবায় আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। নিজেদের আত্মিক উন্নতি ছাড়াই মনে করছি, একটা কিতাব লিখে দিলেই মানুষ ইসলামের পথে এসে পড়বে।

আল্লাহ মাফ করেন– এর থেকে বস্তুবাদী চিন্তায় আমাদের প্রভাবিত হওয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। সালাফের তরীকাকে জানার ব্যাপারে অনুৎসাহ ও অলসতা বোঝা যায়। প্রতিটি কাজে মুন'আম আলাইহিম-এর পথে চলার প্রেরণার অনুপস্থিতি দেখা যায়।

---

৭৩ *মিন মাদাখিলিত তাজদীদ* পৃ. ৭৯-৮১

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমও এক মজলিসে এ ধরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'একটি ফনের উসূল শুধু এই ফনের জন্যই নয়। বরং এই উসূল দিয়ে অন্য ফনও বোঝা যাবে। ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি *আহকামুল কুরআন*-এর শুরুতে একটি ভূমিকা লিখেছেন। তা আমাদের মাঝে *আল-ফুসূল ফিল উসূল* নামে পরিচিত। তিনি উসূলুল ফিকহের কাওয়ায়েদ লিখেছেন কুরআন-তাফসীরের ভূমিকাস্বরূপ। তেমনি উলূমুল হাদীসের কাওয়ায়েদও আপনি অন্যত্র প্রয়োগ করতে পারবেন।' হযরত মাওলানা দামাত বারাকাতুহুম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন মাত্র দশ মিনিটের সে মজলিসে। হায়, যদি লিখে রাখতাম!

আল-ফুসূল গ্রন্থটি *আহকামুল কুরআন*-এর ভূমিকা কিনা– এ নিয়ে দ্বিমত আছে। উভয় পক্ষেরই কিছু দলীল রয়েছে।

৭৪ এর পর দেখতে পেলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর তবারী (মৃত ৩১০ হি.) রহমাতুল্লাহি তাঁর তাফসীর-গ্রন্থে বলেছেন–

«العِبادُ إنما أُمروا أن يبتدئوا عند فواتح أمورهم بتسمية الله تعالى، لا بالخبر عن عظمته وصفاته، كالذي أُمروا به من التسمية عند الذبائح والصيد، وعند المطعم والمشرب، وسائر أفعالهم، فكذلك الذي أُمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله تعالى، وصدور رسائلهم وكتبهم». انتهى. (١١٩/١) في تأويل البسملة.

ছাহিবুল *হিদায়া*র একটি হরকত হল– তিনি সব বিষয়গুলো অত্যন্ত সংক্ষেপে সুস্পষ্ট ভাষায় পেশ করেন। যদি শরাহ ও অন্যান্য গ্রন্থ মুরাজা'আত করা না হয়, তাহলে প্রাথমিক তালিবে ইলম ভাইদের জন্য এটা বোঝা প্রায় অসম্ভব।[৭৫] মাযাহেব ও দালায়েল; উভয়ের ক্ষেত্রেই তিনি এমনটি করে থাকেন। প্রচুর পরিমাণে নস ও শরীয়তের উসূলকে সামনে রেখে নিজের ভাষায় অতি সংক্ষেপে ইস্তেদলাল করেন। এসব নুসূস ও উসূলুশ শারীয়াহ যার জানা নেই তিনি তাঁর কথা বুঝবেন কী করে?

ইমাম রাগেব আসফাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি হরকত হল– তিনি কুরআন মাজীদের সকল কুল্লিয়্যাতের দিকে ইঙ্গিত করেন।[৭৬]

ইবনে নুজাইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আকলের একটি হরকত হল– যত জায়গায় মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা তাঁর কাছে গায়রে ছহীহ মনে হয়েছে, সব স্থানেই তাম্বীহ করেছেন। কিতাবের তাকমিলার লেখকও এ ক্ষেত্রে মূল লেখকের অনুসরণ করেছেন।

তাবয়ীনুল হাক্বায়েক্ব-এর হাশিয়াকার আল্লামা শালাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি হরকত হল– যত স্থানে মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম *তাবয়ীন*-এর তাসামুহাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তিনি সেগুলো হাশিয়ায় নকল করেছেন।

কিতাবুল হুজ্জার যত স্থানে হাফেয আবূ বকর ইবনে আবী শায়বার আপত্তিকৃত মাসআলার পক্ষে হাদীস এসেছে, তত স্থানেই টীকাকার হযরত গীলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাম্বীহ করেছেন। লেখকের ফাহ্মই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এভাবে প্রত্যেক লেখকের কিছু হরকত রয়েছে। আমাদের সেগুলো বুঝতে হবে এবং প্রয়োজনে অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি শাস্ত্রের মুতাকাদ্দিমীনের কিতাব থেকে হরকত গ্রহণ করতে হবে। ফনকে বুঝতে হলে তাদের হরকতকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এই হরকত না বোঝার কারণে আমরা ইবনুল হুমামের **আত-তাহরীর**কে ফাখরুল ইসলাম বাযদাবী ও শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)-এর কিতাবের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসি। এমনকি দাবূসী ও জাস্সাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)-এর কিতাব থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করে ফেলি। তিনি অবশ্যই সংজ্ঞাগুলোর

---

৭৫ ছাহিবুল **হিদায়া**র আরেকটি হরকত হল– তিনি ছরীহ নস উল্লেখ না করে শুধু নসের মাফহূম দিয়ে ইস্তেদলাল করেন। ফলে একই সঙ্গে মাসায়েলের দলিল ও নস থেকে তাঁর ফাহম ফুটে উঠে। তাঁর এই হরকত তাঁর গভীর ফাকাহাতের প্রমাণ বহন করে। (মুহাম্মাদ মুশাররফ)।

৭৬ **ফুসূলুন ফী উসূলিত তাফসীর** পৃ. ৭৯-৮১
রিসালাটি তাফসীরের মূলনীতি বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার একটি কিতাব। লেখক তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো জমা করার চেষ্টা করেছেন। যতটুকু করেছেন খুব সুন্দর হয়েছে। 'আলা বাছিরাতিন' বিষয়টি বোঝার জন্য তাফসীরের গ্রন্থাবলি শুরু-শেষ অধ্যয়ন করতে হবে।

তানকীহ করেছেন। কিন্তু ফিকহুল ফন, সে তো ঐসব ইমামগণের নূরানী সোহবত থেকেই নিতে হবে।[৭৭]

- ইস্তেম্বাতের আরেকটি প্রকার হল– একই লেখক কিংবা বক্তার একাধিক বক্তব্য দেখে তার চেতনা নির্ণয় করা। তার কথার সঠিক অর্থ খুঁজে বের করা।

একটি নমুনা দেখুন :

قال الحاكمُ أبو عبد الله: سمعتُ أبا الطيِّب الكرابيسيَّ يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي يقول: سمعت عليّ بن خَشْرَم يقول: كنا في مجلس سفيان بن عيينةَ، فقال: يا أصحاب الحديث، تعلَّمُوا فقهَ الحديث، لا يقهركمْ أصحابُ الرأي، ما قال أبو حنيفةَ شيئًا إلا ونحنُ نروي فيه حديثًا أو حديثَينِ.

قال: فتركوه، وقالوا: عمرو بن دينار، عمن؟

আলী বিন খশরাম বলেন, আমরা সুফিয়ান বিন উইয়াইনার মজলিসে ছিলাম। তিনি তখন বললেন, 'ওহে হাদীস অন্বেষীরা, তোমরা হাদীসের ফিকহও অর্জন করো। ফকীহরা যেন তোমাদেরকে এ ক্ষেত্রে পরাভূত করতে না পারে। দেখো, আবূ হানীফার প্রত্যেক মাসআলার পক্ষে আমি এক-দু'টি করে হাদীস বর্ণনা করতে পারবো।'

আলী বিন খশরাম বলেন, তখন মুহাদ্দিসরা হযরত সুফিয়ান থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে বললো, আ'মর বিন দীনার কার থেকে বর্ণনা করেছেন?[৭৮]

---

৭৭ কথাটি সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। নতুবা মুহাক্কিক ইমাম ইবনুল হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন কিছু ঈজাদ করেছেন ফিকহুল ফনের জন্য যার বিকল্প পাওয়া বড় দুষ্কর। (মুহাম্মাদ মুশাররফ)।

৭৮ *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস* পৃ. ৬৬ (২০ নং অধ্যায়)।

كتب المؤلِّف على هذا النص من نسخته الذاتية (المطبوعة من دار الكتب العلمية) ما نصُّه:

«هذا النصُّ يدلُّ على أشياء، **منها**: أنَّ الفقه في أصحاب الحديث كان قليلاً، وهو الواقعُ.

ومنها: أنَّ أصحاب الرأي – وهم الحنفية – كانوا أفقه من أصحاب الحديث، بمن فيهم أحمد وابن المديني وابن معين وزهير بن حرب وإسحاق، وهؤلاء من أجلاء أصحاب ابن

উক্ত নসে ইমাম সুফিয়ান বিন উইয়াইনার ফিকহী কোনো ফযীলতও নেই, কোনো মতামতও নেই। হ্যাঁ, ফিকহের সঙ্গে এ কথার অতি দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু লেখক তো অধ্যায় কায়েম করেছেন মুহাদ্দিসদের ফিকহ বয়ান করার জন্য। তাহলে লেখকের উদ্দেশ্য কী? তাসাওউফের দৃষ্টি থেকে বললে বলা যায়– এটাই উদ্দেশ্য। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী অন্যান্য ইমামগণের ব্যাপারে হাকেম ছাহেবের রায় ও অবস্থান দেখলেই বোঝা যাবে, মূলত তিনি কী বোঝাতে চান?

হাকেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি দু'টি সনদে ইমাম আবূ ইউসুফের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন,

قال أبو عبد الله: عبد الله بن شدَّاد هو بنفسه أبو الوليد، ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثلُ هذا الوهم.[৭৯]

যে ভুলের জন্য তিনি ইমাম ছাহেবের ব্যাপারে এত কড়া একটা 'বক্তব্য' ছাড়লেন, সেটাও কিন্তু ইমাম ছাহেবের ভুল নয়– এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।[৮০] 'মাযাহিবুল মুহাদ্দিসীন' অধ্যায়েও তিনি আমাদের ইমামগণের মধ্যে ইমাম যুফার ও ইমাম হাসান বিন যিয়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা-এর ব্যাপারে জার্হ নকল করেছেন! এবার নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটিও পড়ুন :

عيينة. **ومنها**: أن مسائل أبي حنيفة كلها مؤيدةٌ بالأحاديث. **ومنها**: أن سفيان بن عيينةَ كان مُحبًّا لأبي حنيفة. **ومنها**: أنه مع كثرة حديثِه لا يفقهُ فقهَ أبي حنيفة، وأنَّ مجرد الحديث لا يكفي للفقه. **ومنها**: كراهة أصحاب الحديث لأبي حنيفة وللمباحث الفقهية. تاريخ التعليق: ١٣ من ذي الحجة عام ١٤٤٠ هـ». انتهى.

ونزيد الآن: **ومنها**: أنَّ أبا حنيفة كان أبرز فقهاء أهل عصره، بل وأعظمَ مَن بعده إلى أيام سفيان، فحثَّ أصحاب الحديث أن يتعلموا الفقه كما تعلَّمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولازمُ هذا القول: أنه كان حافظًا للحديث أيضًا؛ إذ لا يتأتى للرجل الاجتهاد إلا بحفظ الحديث.

فهذا نموذجٌ من نماذج استنباط الفوائد من النصِّ، ولذلك ذكرْنا التعليقَ هنا.

৭৯ *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস* পৃ. ১৭৮ (৪০ নং অধ্যায়)।

৮০ দেখুন– *মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ* ১/১৫২, *কিতাবুল আছার* পৃ. ৬৪, *জামি'উল মাসানীদ* ১/৪০৯ ও *তানসীকুন নিযাম* ৪৫১-৪৫২

وقال ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم»: أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، عن أبيه، قال: سمعت إسماعيل بن أبي الفضل القُومَسي - وكان من أهل المعرفة بالحديث - يقول:

ثلاثةٌ من الحفاظ لا أحبُّهم؛ لشدة تعصبهم، وقلة إنصافهم: الحاكمُ أبو عبد الله، وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو بكر الخطيب.[৮১]

***

ইমামুল আছর মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি *ফায়যুল বারী*তে বারবার তাম্বীহ করেছেন– একটি হাদীসের মর্ম সঠিকভাবে উদ্ধার করতে হলে একই বিষয়ে সকল হাদীস সামনে রাখতে হবে। একটি উদাহরণ দেখুন :

وعند الترمذي: «أنَّ المجتهد إذا اجتهد فأصاب، فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ»، وقد كان يخطرُ بالبال: أنه ماذا يقولون إذًا في حديثِ «الحسنةُ بعشر أمثالها»؟ حتى وجدتُ في حديثٍ عند أحمد في مسنده: «أنَّ له الأجر بعشر أمثاله»، وحينئذٍ تبيَّن أن ما عند الترمذي بيانٌ للأجر الأصلي، وما عند أحمد بيانٌ للفضلي[৮২].

গলদ ইস্তেম্বাত ও গলদ বুঝ থেকে সাবধান থাকুন। এর জন্যও একাধিক নস দেখতে হবে। আকলকে খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করতে হবে। গলদ ইস্তেম্বাত ও গলদ ইসতেদলালের নমুনা দেখুন :

---

৮১ *তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী (ভূমিকা অংশ) পৃ. ২৪। আরও দেখা যেতে পারে– মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা-এর *তাবসেরা বর মাদখাল* পৃ. ৪৪ (*উসূলে হাদীস কী বা'য আহাম মাবাহেস* শিরোনামে ছাপায় পৃ. ২৭)।
আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসি। তবে তাঁদের এ আচরণ গ্রহণ করি না।

৮২ *ফায়যুল বারী* ৬/৫৩৬ (কিতাবুল 'ইতিছাম বিল-কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ)।

বিখ্যাত মু'তাযিলী ইমাম আবূ আলী জুব্বাঈ ও আবুল কাসেম বলখী (মৃত ৩১৯ হি.)-এর একটি ইস্তেম্বাত ও ইস্তেদলাল দেখুন :

قال تعالى: ﴿الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا﴾.

واستدلَّ أبو عليٍّ الجُبَّائيُّ بهذه الآية على أنَّ الأرض بسيطةٌ، لستْ كرةً، كما يقول المنجِّمون، والبلخيُّ؛ بأن قال: جعلها فراشًا، والفراشُ: البساطُ، بسط الله تعالى إياها، والكرة لا تكون مبسوطةً.

والعقلُ يدلُّ أيضًا على بطلان قولهم؛ لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيها؛ لأن الماء لا يستقرُّ إلا فيما له جنْبَان يتساويان؛ لأن الماء لا يستقر فيه كاستقراره في الأواني، فلو كانت له ناحيةٌ في البحر مستعليةٌ على الناحية الأخرى، لصارَ الماء من الناحية المرتفعة إلى الناحية المنخفضة، كما يصير كذلك إذا امتلأ الإناء الذي فيه الماءُ.

'আবূ আলী জুব্বাঈ এ আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন– যমীন বিছানো, গোলাকার নয়, যেমনটা নক্ষত্র গবেষকরা বলে থাকে। বলখীও এমনটিই বলেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন। কোনো গোলাকার বস্তুকে বিছানো বলা যায় না।

আকলও এর পক্ষে দলিল। কারণ, যমীনে সমুদ্র থাকতে যমীন কখনো গোলাকার হতে পারে না। পানির তবীয়ত হল– দু'টি সমান সমান পাশ না থাকলে পানি স্থির হয় না। যদি সমুদ্রের একটি দিক উঁচু হতো, আর আরেকটি দিক নিচু, তাহলে উঁচু দিক থেকে পানি গড়িয়ে নিচু দিকে পড়তো, পাত্র ভরে গেলে যেমনটা হয়ে থাকে।'[৮৩]

---

৮৩ *তাফসীরু আবিল কাসেম আল-কা'বী আল-বালখী* পৃ. ১১০
আল্লামা জালালুদ্দীন মাহাল্লীও সূরা গাশিয়ার ২০ নং আয়াতে একই মত পেশ করেছেন।

যুক্তিটা আপন জায়গায় ঠিক মনে হলেও বাস্তবতার নিরিখে তা ঠিক নয়। মূলত আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে একপ্রকার মধ্যার্কষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। এ শক্তির কারণেই পৃথিবীতে পানি থাকতে কোনো অসুবিধা হয় না।[৮৪]

তাহলে আবূ 'আলী জুব্বাঈ ও আবুল কাসেম বলখী নিম্নোক্ত আয়াত এবং হাদীসের ব্যাপারে কী বলবেন?

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾. الأنبياء: ١٠٤

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾. الزمر: ٦٧

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: يقبضُ الله تعالى الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملكُ، أين ملوك الأرض؟

ইমামুল আছর মাওলানা কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তো স্পষ্টই বলেছেন,

ولمَّا كانتْ الأرض مجتمعةً غير مجوفةٍ، ناسبَ قبضُها، بخلاف السماء؛ فإنها مبسوطةٌ ومنشورةٌ نشر الثياب، فناسب معها الطيُّ، فوضح وجهُ ذكر القبض مع الأرض، والطي مع السماء. كذا ذكره الصدر الشيرازي.[৮৫]

***

গলদ ইস্তেম্বাত থেকে বাঁচার জন্য একই লেখকের ভিন্ন বক্তব্য দেখুন। একটি নমুনা লক্ষ্য করুন :

আবূ মুহাম্মাদ ইবনুল ফারাস আন্দালুসী আবদুল মুনয়ি'ম বিন আবদুর রহীম (মৃত ৫৯৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وحكى المَهْدُوِيُّ عن قومٍ: أنَّ هذه الآية على هذا التأويل ناسخةٌ لفعلٍ قد كان مباحًا.

---

৮৪ মধ্যাকর্ষণশক্তির আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বলা হয়, নিউটন হলেন এর আবিষ্কারক। এ কথা মোটেও ঠিক নয়। বিস্তারিত দেখুন ড. রাগেব সারজানীর *মাযা কদ্দামাল মুসলিমূনা লিল-'আলাম* ১/২৬৭-২৬৮

৮৫ *ফায়যুল বারী* ৬/২৭৭-২৭৮ (কিতাবুর রিকাক-এর যমীন কবয করার অধ্যায়)।

قال أبو محمد: «وليس في هذه الآية شرط النسخ؛ لأن الأول لم يكن شرعًا متقررًا».

ثم نقض ذلك عن قربٍ، فقال في قراءة منْ قرأ (راعنًا) - بالتنوين -: «إن اليهود كانتْ تقوله، فنهى الله تعالى المؤمنين عن القول المباح سدًّا للذريعة؛ لئلا يتطرَّقَ اليهود إلى المحظور».

وقولُه: «فنَهى الله المؤمنين عن القول المباح» هو النسخ بعينه، فلا معنى لإنكار ما ذكره المهدوي.

'মাহদুয়ী এক জামাত উলামায়ে কেরাম থেকে নকল করেছেন– উক্ত ব্যাখ্যা[৮৬] অনুযায়ী আয়াতটি একটি মুবাহ কর্মের নাসেখ।

আবূ মুহাম্মাদ ইবনে আতিয়্যা[৮৭] বলেছেন, "এই আয়াতে নাসখের কোনো বিষয় নেই। কারণ, প্রথম বিধানটি পূর্বে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল না।"

এর সামান্য পরই আবূ মুহাম্মাদ নিজের মতের বিরোধিতা করেছেন। راعنًا শব্দটির তানবীনের কেরাতের ব্যাপারে বলেছেন, "এটা ইহুদীরা বলতো। আল্লাহ মুমিনদেরকে মুবাহ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যেন ইহুদীরা মন্দের সুযোগ পেয়ে না যায়।"

এটাই তো নাস্খ। তাহলে মাহদুয়ীর কথা কেন খণ্ডন করা?'[৮৮]

আপনি ইবনে আতিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা মনোযোগের সঙ্গে পড়ে দেখুন– তাঁর কথায় কোনো তানাকুয নেই। বরং আমাদের লেখক ইবনুল ফারাস ইবনে আতিয়্যার কথা বুঝতে স্পষ্টই ওয়াহামের শিকার হয়েছেন। চিন্তা করে দেখুন– ইবনে আতিয়্যা বোঝাচ্ছেন, পূর্বে যদি নসের মাধ্যমে কোনো বিধান দেয়া থাকে এবং এরপর

---

৮৬ উক্ত ব্যাখ্যা বলে তিনি বোঝাচ্ছেন– راعِنًا শব্দটি আনছারদের লুগাত ছিল। তাঁরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এটা বলতো। এর ফলে ইহুদীরা জিহ্বা বাঁকা করে শব্দটি মন্দ অর্থে ব্যবহার করতো।

৮৭ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল হক বিন গালিব। তিনি ইবনে আতিয়্যা নামেই প্রসিদ্ধ। ওফাত ৫৪১ হিজরীতে।

৮৮ *আহকামুল কুরআন*, ইবনুল ফারাস আন্দালূসী ১/৮৯

ভিন্ন নসের মাধ্যমে সে বিধানকে রহিত করা হয়, তাহলে হবে নাস্‌খ। এটা তাঁর কথার পূর্বাপর থেকে এমনিতেই বোঝা যায়।

পরে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য পেয়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন,

وحدُّ الناسخ عند حُذَّاق أهل السُّنَّة: الخطابُ الدالُّ على ارتفاع الحكم الثابت **بالخطاب المتقدم** على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.[৮৯]

- **ইস্তেম্বাতের আরেকটি দিক হল– শব্দ থেকে ইস্তেম্বাত করা। কিছু উদাহরণ দেখুন :**

এক.

হাফেয আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল 'আরাবী (মৃত ৫৪৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

إنَّ قوله تعالى: ﴿مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ﴾ يقتضي أنها لجميع المسلمين عامةً، الذين يعظِّمون الله تعالى، وذلك حكمها بإجماع الأمة على أن البقعة إذا عُيِّنت للصلاة، خرجتْ عن جملة الأملاك المختصَّةِ بربها، فصارتْ عامةً لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها، فلو بنى الرجل في داره مسجدًا، وحجزه عن الناس، واختصَّ به لنفسه= لَبقي على ملكه، ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه للناسِ كلهم، لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة، وخرج عن اختصاص الأملاك.[৯০]

---

৮৯ *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয* ১/৩০৯ (কাতারের ছাপা), ১/১৯১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যার ছাপা)। একই লেখকের বিভিন্ন কিতাব দেখে সঠিক ব্যাখ্যা করার অত্যন্ত চমৎকার ও মুআদ্দাবানা একটি নমুনা দেখুন, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (দামাত বারকাতুহুম)-এর সদ্য প্রকাশিত উলূমুল হাদীসের অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ *আল-ওয়াজীয*-এ। পৃ. ৪৪-৪৫

৯০ *আহকামুল কুরআন* ১/৪৩

এখানে হাফেয ফকীহ আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইস্তেম্বাতের জন্য নসের লফযের পাশাপাশি একটি ইজমা'ঈ বিধানকেও সামনে রেখেছেন। অর্থাৎ শুধু নসের আলোকে বিধান বোঝার সুযোগ নেই। সঙ্গে অন্য কিছুও জানা থাকা দরকার।

দুই.

ইবনুল ফারাস আন্দালুসী বলেন,

وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾، فيه دليلٌ على جواز تسمية الأطفال عند الولادة؛ لأنها إنما قالتْ هذا بإثر الوضع.[৯১]

কারো প্রশ্ন হতে পারে– উম্মে মারয়াম যে জন্মের পর-পরই নাম রেখেছেন, সেটা তো নস থেকে বোঝা যায় না! এবার পুরো আয়াতটি নিয়ে ভাবুন। দেখুন, এ অংশটি পিছনের অংশের সঙ্গে আতফ হওয়াতেই মূলত বোঝা গেছে– তিনি জন্মের পর-পরই নাম রেখেছেন।

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى.) وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا﴾ إلخ

বন্ধনীযুক্ত বাক্য দু'টি জুমলায়ে মু'তারিযা। জবাব শর্তের পর-পর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

লক্ষ্য করুন– ইবনুল ফারাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি আয়াতের আগ-পর চিন্তা করে এই বিধানটি ইস্তেম্বাত করেছেন। একই বিষয়ে আরেকটি অতি সূক্ষ্ম নমুনা দেখুন ইমাম আবূ বকর আল-জাস্‌সাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর বক্তব্যে :

সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতে উল্লেখিত لَمَسْتُمُ শব্দটির অর্থ শুধু স্পর্শ করা নয়; বরং 'হামবেস্তরী'– এর পক্ষে তিনি বলেন,

---

৯১ *আহকামুল কুরআন ২/৮*

ويدلُّ على أنَّ المراد: الجماعُ، دون لمسِ اليد= أنَّ الله تعالى قال: ﴿وإذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾، أبان به عن حكم الحدَثِ في حال وجود الماء.

ثمَّ عطفَ عليه قولَه تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله ﴿فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾، فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء.

فوجب أن يكون قوله ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ على الجنابة؛ لتكون الآيةُ منتظمةً لهما،/ مُبيِّنةً لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه، ولو كان المرادُ اللمسُ باليد، لكان ذكر التيمم مقصورًا على حال الحدث دون الجنابة، غيرَ مفيدٍ لحكم الجنابة في حال عدم الماء، وحمل الآية على فائدتين أَولى من الاقتصار بها على فائدةٍ واحدةٍ.[৯২]

চিন্তা করুন– কতটা সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন! আল্লাহ হযরাতুল ইমাম আবূ বকর আল-জাস্‌সাসের প্রতি রহমতের সাগর প্রবাহিত করুন। রিযওয়ানের ঝর্ণায় তাঁকে অবগাহন করান। নেয়ামতে-রহমতে তাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখুন। আমীন।

তিন.

কখনো এমন হয় যে, শুধু শব্দ থেকে ইস্তেম্বাত করা যায় না। ইস্তেম্বাত করতে হয় ইতিহাসকে সামনে রেখে। একটি নমুনা দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৩৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا﴾

---

৯২ আহকামুল কুরআন ২/৫২২-৫২৩

এই বক্তব্যটি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ছেলেদের। তাদের দাদা তো ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম। তারপরও তারা দলিল হিসেবে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর নাম কেন উল্লেখ করছে? এর থেকে কয়েকটি কথা বোঝা যায়–

- ✓ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর নাম প্রথমে উল্লেখ করা থেকে বোঝা যায়– তারা বয়স্ককে সম্মান করতেন। বড়দের সঙ্গে আদবের এটি একটি নমুনা। যদিও কুরআনে 'জ্ঞানী বালক' বলা হয়েছে হযরত ইসহাকের ব্যাপারে। আর 'সহনশীল বালক' বলা হয়েছে হযরত ইসমাঈলের ক্ষেত্রে।
- ✓ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় তারা বড় যত্নশীল ছিল। হযরত ইসমাঈল তো ছিলেন হিজাযের অধিবাসী। আর হযরত ইসহাক ছিলেন শামের অধিবাসী। হযরত ইয়াকুব শেষ যমানায় মিশরের অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। ভৌগলিক দূরত্ব ও যামানার দূরবর্তীতা সত্ত্বেও তারা হযরত ইসমাঈলের কথা ভুলে নি।

আরেকটি নমুনা দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

কাযী আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

ما فائدةُ تخصيص (الحجِّ) آخرًا، مع دخوله في عموم اللفظ الأول؟ وهي: أنَّ العرب كانت تحجُّ بالعدد، وتُبَدِّل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم، وجعله مقرونًا بالرؤية[৯৩].

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে আরবদের ইতিহাস সামনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। এ নীতি অনুসরণ না করলে অনেক স্থানেই প্রশ্ন থেকে যাবে। আয়াতের সূক্ষ্মতা বুঝে আসবে না। আবার কখনো গলদ বুঝে আসবে, যেমনটা কারো কারো হয়েছে। তাফসীরের কিতাবাদি নয়; বরং শুধু কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তা করলেও এ সংশয় দূর হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহু তা'আলা। একটি জাতির উপর কিতাব নাযিল

---

৯৩ আহকামুল কুরআন ১/১০৩

হবে, আর তাদের অবস্থা ও ইতিহাস মোটেও লক্ষ্য রাখা হবে না, এটা তো হতে পারে না।[৯৪]

- ইস্তেম্বাতের আরেকটি দিক হল– একাধিক নসকে সামনে রেখে ইস্তেম্বাত করা।

ইমাম আবূ বকর আল-জাস্‌সাস পিছনের আয়াতের তাফসীরেই বলেন,

وأيضًا: اللمسُ يحتمل الجماعَ على ما تأوَّله عليٌّ وابن عباسٍ وأبو موسى، ويحتمل اللمس باليد على ما رُوِيَ عن عمر وابن مسعودٍ رضي الله عنهم، فلما رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قبَّلَ بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ= أبانَ ذلك عن مراد الله تعالى.[৯৫]

- যে কোনো গ্রন্থ থেকে সঠিক ইস্তেম্বাত ও গ্রন্থের বিভ্রাটপূর্ণ জায়গাগুলো সহীহভাবে বুঝতে হলে, সে গ্রন্থের মানহাজ বোঝার চেষ্টা করুন। অধিকাংশ মুহাক্কিক ইমামগণের কিতাবে মানহাজ উল্লেখ থাকে না। বারবার অধ্যয়ন করে সে মানহাজ পাঠকেরই ইস্তেম্বাত করে নিতে হয়। মানহাজ যদি আপনি বুঝতে পারেন, জ্ঞানের সাগর প্রবাহিত হবে আপনার হৃদয়ে, ইলমের আলো উপচে আপনার কলবে। কুরআন মাজীদ থেকে একটি উদাহরণ দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইসরার ৩৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. اِنَّه كَانَ مَنْصُوْرًا﴾

আয়াতে উল্লেখিত যমীরটির মারজি' নির্ধারণ করতে গিয়ে অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেছেন, নিহত ব্যক্তির ওলী হল মারজি'। এর পক্ষে একটি শায কেরাত পেশ করা যেতে পারে–

---

৯৪ মূলনীতিটির গুরুত্ব বোঝার জন্য দেখুন– আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাফসীরের ভূমিকা (১/২৫)। আরও বিস্তারিত দেখা যেতে লেখকের معرفة تاريخ العرب: أثرها وأهميتها في فهم التنزيل الحكيم নামক মাকালায়।

৯৫ *আহকামুল কুরআন ২/৫২১*

﴿فَلَا تُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾ (৯৬)

কিন্তু লেখকের বুঝে আসছিল, যমীরটির মারজি' হবে হত্যাকারী। পরে দেখতে পেলাম সীগাটি ওয়াহেদ মুযাক্কার হাযেরের সীগা হিসেবে ভিন্ন কেরাতে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আন্নাহ্হাস (মৃত ৩৩৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وقد يجوز بالتاء، ويكون للولي أيضًا، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة.

'ت দিয়ে কেরাত পড়াও সঠিক। তখনও ওলীই এর মুখাতাব হবে। তবে খেতাব গায়েব থেকে হাযেরের দিকে ঘুরে যাবে।'(৯৭)

ওলীকে খেতাব করা হলে বাহ্যত পরের যমীরটি হত্যাকারীর দিকে ফেরাটাই স্বাভাবিক। এই মতের পক্ষে সবচেয়ে বড় দলিল হলো কুরআনুল কারীমের মানহাজ।

কুরআন মাজীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানহাজ ও আদত হল– অন্যায় ও যুলুমের বিচার গ্রহণের অধিকার ও অনুমতি দেয়া। তবে মানুষের বাড়াবাড়ি ও বেইনসাফীর কারণে সঙ্গে সঙ্গে কুরআন তাকওয়ারও উপদেশ দেয়, সীমালঙ্ঘন থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে। নমুনাস্বরূপ কিছু আয়াত দেখুন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ... فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾. البقرة: ١٧٨

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾. البقرة: ١٩٠

---

৯৬ *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, কুরতুবী ৫/৫৯১

৯৭ *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন*, কুরতুবী ৫/৫৯১
এরপর আল্লাহ আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান 'মাদরাসাতুন নূর আল-ইসলামিয়্যা'কে ইমাম নাহ্হাসের *মা'আনিল কুরআন*ও দান করেছেন। এ শব্দেই 'ইবারতটি তিনি উল্লেখ করেছেন। (২/৬৫৬)।
وقد يمكن أن يكون معنى قوله «إلاَّ أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة» أن المراد بالضمير هو ما في قوله تعالى ﴿إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾، لا ما في قوله تعالى ﴿فَلَا تُسۡرِف﴾، ولعله بعيدٌ. والله تعالى أعلم.

﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾. البقرة: ١٩٤

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ تَعْتَدُوْا. وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى. وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللهَ. اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾. المائدة: ٢

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا. اعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى. وَاتَّقُوا اللهَ. اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾. المائدة: ٨

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّه. وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾. المائدة: ٤٥

﴿وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ﴾. النحل: ١٢٦

﴿وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى اَمْرِ اللهِ. فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا. اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۞﴾. الحجرات: ٩، ١٠

ইস্তেম্বাত সম্পর্কে আরও কথা রয়েছে। যতটুকু বলা হয়েছে বোঝার জন্য আশা করি যথেষ্ট। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

মূলে পৌঁছার চেষ্টা করুন

প্রত্যেক লেখকের কিতাবেই মানুষ হিসেবে কিছু না কিছু ভুল থেকে যাওয়াটা দোষের নয়। ভুলের সব প্রকার একটি কিতাবে না থাকলেও কোনো না কোনো প্রকারের ভুল অবশ্যই থাকে। এটা মানবিক দুর্বলতা, সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা।

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হল–

১. মৌলিক ভুল বোঝার চেষ্টা করা। যথাসম্ভব শাখাগত ভুল এড়িয়ে চলা।
২. এবং বিভিন্ন ভুলকে মিলিয়ে ভুলের উৎস নির্ণয় করা।

আরববিশ্বের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানী (হাফিযাহুল্লাহু ওয়া-রা'আহু)। তাঁর কলম ইসলাম ও মুসলমানদের অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছে দীর্ঘ সময়। লেখকেরও তাঁর কলম থেকে বেশ উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত মূল গ্রন্থের তুলনায় অনুবাদ থেকেই উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়েছে বেশি। তাঁর আরবী মূল গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করতে আমরা খুব আগ্রহী। আল্লাহ সহজ করুন। আমীন।

সম্ভবত আমার মত অন্য অনেকের অনুভূতিই এমন। আল্লাহ হযরতকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

মাযা কদ্দামাল মুসলিমূনা লিল-'আলাম [৯৮] ড. সারজানীর বিখ্যাত একটি গবেষণাগ্রন্থ। মনে করি– ইসলাম ও মুসলমানদের যারা বিশেষ খেদমত করতে আগ্রহী তাদের জন্য এ বই পড়া অত্যন্ত উপকারী এবং জরুরীও। পাঠকমাত্রই লেখকের অধ্যয়ন-ব্যাপ্তি ও প্রচুর পরিশ্রম অনুভব করতে পারবেন বইটির পাতায় পাতায়।

কিন্তু দু'টি বিষয় আমাদেরকে দারুনভাবে চিন্তিত করে তোলে। কারণ, এগুলোকে আমরা মৌলিক ভুল মনে করি। যদি বলা হয়– এ ভুলের কারণে আমরা মর্মাহত, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত, মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না।

---

৯৮ *মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে* নামে মাকতাবাতুল হাসান থেকে বইটি চার খণ্ডে অনুদিত হয়েছে। আরবী বইটি দুই খণ্ডে রচিত। লেখকের সরাসরি আরবী থেকেই ইস্তেফাদা করার সুযোগ হয়েছে।

এক.

লেখক কিতাবের একাধিক স্থানে ইকদামী জিহাদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা উল্লেখ করেছেন। আফসোস, ইখতেলাফের ছুতায় ইসলামের একটি সর্বসম্মত বিষয়কে অস্বীকার করা হচ্ছে! অথচ তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী ইতিহাসের সকল কিতাবই এর পক্ষে সাক্ষ্য দান করে।[৯৯]

এই ভুলের গোড়া হল– পশ্চিমাদের আপত্তির ভয়। ড. সারজানীর সম্মানার্থেই এ কথা বলা হল। অনেকের ক্ষেত্রেই এ ভুলের মূল কারণ হল– পশ্চিমাদের চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে ইসলামকে নতুন করে ঢেলে সাজানো। পশ্চিমারা যেটাকে বর্বরতা বলবে সেটাকে যে কোনো মূল্যেই হোক ইসলাম থেকে বের করে দিতে হবে! পশ্চিমারা যেটাকে ইনসাফ বলবে সেটাই হবে ইনসাফ!! নিজের বুঝে না আসলেই আপত্তি করবে ইসলামের ধারক ও রক্ষক উলামায়ে কেরামের উপর, কিংবা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে তোহমতের আঘাত করতে থাকবে ইসলাম অপরাজেয় কেল্লা উলামায়ে উম্মাতের উপর। পাহাড়ের সঙ্গে মাথা টাক দিলে কি পাহাড়ের ক্ষতি হয়?

হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ইকদামী জিহাদের ব্যাপারে ইজমা' নকল করে বলেন,

ولكنْ ظهرَ في القرنِ الرابعَ عشر رجالٌ، أرادوا تطبيقَ الإسلام على النظريات والأفكار الغربية، فحاوَلوا في كثيرٍ من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلاميِّ آراءً موافِقةً لأهواء أهل الغرب، ويُلقِموها في فم النصوص الشرعية كُرهًا، إرضاءً للمستعمِرين والمستشرقين، وتناسَوا قول الله سبحانه ﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ﴾.

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعةً، لا سلَفَ لهم فيها، وهي: أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط، وأنَّ المسلمين لا يجوزُ لهم أن يغزوا الكفار؛ لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام، وإعلاءِ كلمة الله على كلمتهم، إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين.

---

৯৯ উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নমুনা দেখুন–
কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফেয়ী ৫/১৪৪, *আহকামুল কুরআন*, ইমাম আবূ বকর আল-জাস্‌সাস রাযী ১/৩৫৪ ও *আল-ইকনা' ফী মাসায়িলিল ইজমা'* ১/৩৬৩

وأولُ ما ظهر هذا الرأي المبتَدَع - فيما نعلم - على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة، التي من أشهرِ رجالها: المفتي محمد عبده، ورشيد رضا، وجمال الدين الأفغاني في البلاد العربية، وسر سيد أحمد خان، وجراغ علي، وأمثالهما في الهند، وقد حذًا حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني، صاحب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا.

'তবে চতুর্দশ শতাব্দীতে এমন কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করেছে, যারা ইসলামকে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার ছাঁচে ঢালতে চেয়েছে। ঔপনিবেশিক ও প্রাচ্যবিদদের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তারা ইসলামী ফিকহের অনেক বিধানকে পশ্চিমাদের প্রবৃত্তি অনুসারে সাজিয়ে দেখিয়েছে। তাদের এই চিন্তা তারা জোর করেই কুরআন-সুন্নাহর বাণীর মুখে পাথরের মত ভরে দিয়েছে। কিন্তু হায়, তারা ভুলে গেছে যে, তাদের রব বলেছেন, "আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না তোমার প্রতি ইহুদীরা, আর না খৃস্টানরা, তুমি অনুসরণ করা পর্যন্ত তাদের ধর্ম। বলে দিন আপনি– নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়েতই হেদায়েত।"

এরা জিহাদের ব্যাপারে এমন এক বিদ'আতের আবিষ্কার করেছে, ইতিপূর্বে যা কেউ করে নি। সেটা হল– ইসলামে জিহাদ বৈধ শুধু প্রতিহত করার জন্যই। তাহলে কাফেররা শুরু করলেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে। অন্যথায় ইসলামের শক্তি তাদের উপর জয়ী করার জন্য, কিংবা আল্লাহর কালিমাকে পৃথিবীতে বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করা যাবে না।

আমাদের জানা মতে– নব্য আকল-নির্ভর চেতনাধারীদের পক্ষ থেকেই সর্বপ্রথম এ বিদ'আত প্রকাশিত হয়েছে। এসব চেতনাধারীদের মধ্য হতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হলেন– মুফতী মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রশীদ রেযা ও জামালুদ্দীন আফগানী। এরা সবাই আরববিশ্বের। হিন্দুস্তানে এসব চেতনাধারীদের মধ্যে রয়েছেন– স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান দেহলবী এবং চেরাগ আলী। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন *সীরাতুন্নবী*-এর লেখক মাওলানা শিবলী নো'মানী[১০০] ।'[১০১]

১০০ *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম* ৩/১০

১০১ স্যার সাইয়েদ আহমাদ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা শিবলী নো'মানী সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা কম। আফসোস, অধিকাংশ মানুষ তাদের ভ্রান্ত চিন্তা সম্পর্কে একেবারেই বেখবর। আল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ ইউসুফ বানূরীকে জাযায়ে খায়র দান করুন। তিনি প্রায়

দুই.

ড. সারজানী ছাহেব তাজমহল, আল-হামরাসহ স্থাপনাকে মুসলমানদের অবদান হিসেবে দেখিয়েছেন। অথচ সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়েছিল একান্তই কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে। এই ভোগ-বিলাসই ছিল ইসলাম-প্রাসাদে শয়তান ও তার দোসরদের প্রথম কুঠারাঘাত। এর মাধ্যমেই তৈরী হয়েছে শত শত বছরের মুসলমানদের অধঃপতনের মর্মান্তিক ইতিহাস! কিন্তু হায়, এসবই হয়ে গেল আজ আমাদের অবদান!!

পশ্চিমারা যেটাকে ভালো বলে আমরাও চোখ বুজে সেটাকে ভালো বলে মেনে নিই। একবারও কি ভেবেছি– স্থাপনার ক্ষেত্রে ইসলাম আমাদেরকে কী নীতি অনুসরণ করতে বলেছে? হযরত ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামের ধারক ও রক্ষকেরা এক্ষেত্রে কী বুঝেছেন আর কী আমল করেছেন? আফসোস, শত আফসোস আমাদের এই আধূরা ইসলামের প্রতি!

দেখুন, এই একই বিষয়টাকে আরেকজন আলিম কিভাবে দেখছেন! কী চমৎকার তাঁর চিন্তা! তিনি হলেন আমাদের আদীব হুযূর দামাত বারাকাতুহুম। হুযূর বলেন,

> 'যারা ভারত সফর করেছেন তাদের লেখা সফরনামাগুলো আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ি এবং বারবার পড়ি। আমার কাছে ঐসব সফরনামার একটি ভালো সংগ্রহও রয়েছে। যখন লালকেল্লা ও কুতুবমিনারের কথা পড়ি, ভিতরে সত্যি যেন রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তবে তাজমহলের কথা পড়তে আমার ভালো লাগে না, একদম না। আমার বন্ধু মাওলানা ইয়াহইয়া তাজমহল দেখে এসে শোনাতে চেয়েছিল তাজমহলের কথা; শুনিনি। তাকে বলেছিলাম, শাহজাহানের তাজমহলই তো ডেকে এনেছে আমাদের দুর্গতি। ভারতে শাহজাহান যখন রাজকোষ শুন্য করে তাজমহল তৈরী করেছেন ব্রিটেনের

শত বছর আগেই ১৩৫৬ হিজরীতে আমাদেরকে এ তিন ব্যক্তির চিন্তা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তাঁর অদ্বিতীয় গ্রন্থ **ইয়াতীমাতুল বায়ান ফী শাইয়িম মিন উলূমিল কুরআন**-এ। হিন্দুস্তানের গোমরাহদের তাফসীর সম্পর্কে সম্ভবত এতটা সুস্পষ্ট ও মুনছিফানা বক্তব্য কেউ দেন নি। স্যার সাইয়েদের তাফসীর থেকে শুরু করে মাওলানা মওদূদীর **তাফহীম** পর্যন্ত সবই উঠে এসেছে হযরত বানূরীর শানিত কলমে। আর 'ইজাযুল কুরআন সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা তো আলাদা গবেষণা গ্রন্থের মানে উত্তীর্ণ। আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের লাজনার পক্ষ থেকে এ কিতাবের তাহকীক-তা'লীকের কাজ করা হয়েছে। আল্লাহ তাওফীক দিলে সুযোগ বুঝে ছাপা হবে।

তাদের আরও কিছু ভুলের জন্য দেখা যেতে পারে হযরত শাইখুল ইসলামেরই রচিত– ***উলূমুল কুরআন*** (পৃষ্ঠা ৩৮৫ ও ৪১১-৪১২), *তাবসেরে* (পৃষ্ঠা) ও ***আহকামুয যাবায়েহ*** (পৃষ্ঠা)। উপরোক্ত কিতাব দু'টির নিজস্ব কপি লেখকের সংগ্রহে নেই। আমাদের প্রিয় শাগরেদ সাঈদুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ ঢাকুবীর কপিই পড়ার সুযোগ হয়েছিল।

রাজা তখন অস্ত্রের কারখানা তৈরী করেছেন। যিনি বলেছেন সত্য বলেছেন, তাজমহলই কেড়ে নিয়েছে আমাদের মাথার তাজ।'[১০২]

এবার পড়ুন নিম্নের রসে উপচে পড়া বক্তব্যটি–

'তবে তাঁর *আকাবির কা তাকওয়া* এবং *আকাবির কা রমযান* পড়ে কৈশোরের সবুজ হৃদয়ে পূর্বসূরির প্রতি শ্রদ্ধার যে তাজমহল তৈরী করেছিলাম রাতের নিশুতি প্রহরে–সেই তাজমহলের ছায়া ছেড়ে আজও পালাতে পারিনি।'

১০২ *তুরস্কে তুর্কিস্তানের সন্ধানে* পৃ. ৯৯

প্রকৃত অবস্থা বুঝে অধ্যয়ন করুন

বাস্তবতা বুঝে অধ্যয়ন করা– গ্রন্থ-অধ্যয়নের অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি দিক। কখনো দেখা যায়, একটি বিষয় যৌক্তিকভাবে তো ঠিক। কিন্তু বাস্তবতার মানদণ্ডে সেটা স্পষ্টই ভুল।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾

'এমন অবস্থায় যে, তা হকই। সত্যায়নকারী তাকে যা রয়েছে তাদের সঙ্গে।'[১০৩]

বিখ্যাত ইমাম সীবাওয়াইহ (মৃত ১৮০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, مصدقًا হচ্ছে হালে মুআক্কিদা।[১০৪] তথা, তা পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তুকে আরও জোরদার করছে।[১০৫] ভিন্ন নতুন কোনো অর্থ প্রদান করছে না।

আল্লামা ইবনে 'আশূর বলেন,

وعندي: أنها حالٌ مؤسِّسةٌ؛ لأن قوله تعالى ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ مُشعِرٌ بوصفٍ زائدٍ على مضمون ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾؛ إذ قد يكون الكتابُ حقًّا، ولا يصدِّق كتابًا آخر.

---

১০৩ সূরা বাকারা, আয়াত নং ৯১

১০৪ *আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ইমাম আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ সা'আলিবী (মৃত ৮৭৫ হি.) ১/২৮১। *তাফসীরে সা'আলিবী* নামে প্রসিদ্ধ। আরেকজন সা'আলিবী হলেন ইমাম আবূ ইসহাক আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম সা'লাবী ও সা'আলিবী নিশাপূরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মৃত্যু ৪২৭ হিজরীতে। আরেকজন হলেন আবূ মানছূর আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল। তিনি *ফিকহুল লুগাহ* কিতাবের রচয়িতা। তাঁর মৃত্যু ৪৩০ হিজরীতে। তাঁর বাড়ীও নিশাপূরে। *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ১০/৫৩২-৫৩৩

১০৫ *মুখতাছারুল মা'আনী* ১/৪৯৭ (ফছ্‌ল ও ওয়াছ্‌ল-এর বহছের শেষে)।

'আমার দৃষ্টিতে এটা হালে মুআসসিসা। কারণ, مصدقا لما معهم অংশটি وهو الحق থেকেও অতিরিক্ত একটি গুণ বোঝাচ্ছে। কেননা, কিতাব হক হওয়া সত্ত্বেও এমন হতে পারে যে, অন্য কিতাবকে সত্যায়ন করছে না।'[১০৬]

দেখুন, যৌক্তিকভাবে ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা কি কেউ খণ্ডন করতে পারবে? কিন্তু তাঁর এ কথা 'কেননা, কিতাব হক হওয়া সত্ত্বেও এমন হতে পারে যে, অন্য কিতাবকে সত্যায়ন করছে না।' কি বাস্তবসম্মত? আসমানী যে কোনো কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করবে– এটা হল প্রকৃত বাস্তবতা। যদিও যৌক্তিকভাবে এটা জরুরী নয় যে, একটি কিতাব হক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিতাবকে সত্যায়নও করতে হবে। এ বাস্তবতাকে সামনে রাখলে ইমাম সীবাওয়াইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথার গভীরতা ও সঠিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ আমাদের ইমামগণকে জাযায়ে খায়র দান করুন। তাঁদের দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম ছিল!

***

আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মাহদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর ব্যাপারে কালাম করতে গিয়ে বলেন,

الطريقُ الأوَّلُ: روَى الترمذي وأبو داود، من طريق عاصم بن بَهْدَلَةَ، عن زِرّ بن حُبَيشٍ، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يَبقَ من الدنيا إلاَّ يومٌ لطوَّلَ الله تعالى ذلك اليومَ، ثمَّ اتفقوا حتى يبعث الله فيه رجلاً من أهل بيتي يُواطئ اسْمُه اسمي، واسمُ أبيه اسمَ أبي.

...

الطريق الخامسُ: روى الترمذي وابن ماجه من طريق زيد العَمِّي إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ في أمتي المهديّ، يخرجُ يعيشُ خمسًا أو سبعًا أو تسعًا من سنين، فيجيءُ إليه رجلٌ، فيقول: يا مهدي، أعطني، قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله.

...

---

১০৬ *আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর* ১/৬০৮

وهذه الطرقُ كلها متكلَّمٌ فيها، فأما الأولُ: ففيه عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، وقد ضعَّفَه من جهة ضبطه وحفظه: ابن سعد، ويعقوب، وأبو حاتم، وابن عُلَيَّة، وابن خراش، والعُقيلي، ويحيى القطان، وضعَّفَه العجلي في روايته عن زر، ولذلك لم يُخرِّج له البخاري ومسلم إلا مقرونًا بغيره،/ فحديثُه قيل: حسنٌ، لا يبلغ مرتبة الصحة، وقيل: دون الحسن، وهو الظاهر الجاري على قاعدة الحديث الحسن، وإن كان الترمذي وسَمه بالحسن والصحة.

وأمّا الطريق الخامس، ففيه زيد العمي، وقد ضعَّفه أبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وابن معين، وأبو زرعة.

'প্রথম হাদীস :[১০৭]

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ 'আছেম বিন বাহদালার সূত্রে, তিনি যির বিন হুবাইশ থেকে। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি দুনিয়া ধ্বংসের মাত্র একদিনও বাকী থাকে আল্লাহ ওই দিনকে সুদীর্ঘ করে দিবেন। সকল মানুষেরা একমত হয়ে একজন ব্যক্তিকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করবে। সে হবে আমারই বংশধর। আমার নামের সঙ্গে তার নাম মিলে যাবে এবং আমার বাবার নামের সঙ্গেও তার বাবার নাম মিলে যাবে।'

...

পঞ্চম হাদীস :

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ যায়দ আল-'আম্মীর সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মাঝেই আসবে মাহদী। তিনি পাঁচ, সাত কিংবা নয় বছর জীবিত থাকবে।[১০৮] তখন একলোক তার কাছে এসে বলবে,

---

১০৭ তিনি হাদীস বোঝাতে গিয়ে طريق শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আহলে ফন طريق শব্দটি ব্যবহার করেন একই হাদীসের বিভিন্ন সনদের অর্থে। আরবরা বড় সত্য বলেছেন, 'প্রতিটি ফনেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন। সেখানে শুধু তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য। প্রতিটি স্থানেই বিশেষ কথা রয়েছে। ওখানে শুধু ওটাই উপযুক্ত।'

১০৮ সন্দেহ (পাঁচ, সাত বা নয়) বর্ণনাকারী যায়দ আল-'আম্মীর পক্ষ থেকে। মূল হাদীসে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেন নি। *আল-জামি'*, ইমাম তিরমিযী ২/৪৭ ('মাহদীর ব্যাপারে হাদীসে যা এসেছে' অধ্যায়ে বর্ণিত)।

আমাকে কিছু দিন। তিনি তাকে তার কাপড়ে ধারণ করতে সক্ষম পরিমাণ মাল দিয়ে দিবেন।'

...

এই সবগুলো সনদেই কালাম রয়েছে। প্রথম হাদীসটির সনদে রয়েছেন 'আছেম বিন বাহদালা। তাঁর মুখস্থশক্তি ও ধারণশক্তির দুর্বলতার কারণে তাকে দুর্বল বলেছেন ইবনে সা'দ, ইয়াকুব, আবূ হাতেম, ইবনে 'উলাইয়্যা, ইবনে খিরাশ, 'উকাইলী ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান। আর ই'জলী যির বিন হুবাইশ থেকে তার বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। এজন্যই ইমাম বুখারী ও মুসলিম মুতাবা'আত ছাড়া তাঁর বর্ণনা ***সহীহাইন***-এ উল্লেখ করেন নি। তাই বলা হয়, তাঁর হাদীস হাসান, যা সহীহের মানে উত্তীর্ণ হয় না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হাসানের চেয়েও নিম্ন। হাসান হাদীসের কায়েদা থেকে এটাই বোঝা যায়। যদিও ইমাম তিরমিযী তাঁর হাদীসকে "হাসানুন সহীহুন" বলেছেন।

...

পঞ্চম হাদীসটিতে রয়েছেন যায়দ আল-'আম্মী। তাকে দুর্বল বলেছেন আবূ হাতেম, নাসাঈ, ইবনে 'আদী, ইবনে মা'ঈন ও আবূ যুর'আ রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।'[১০৯]

ইমাম মাহদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামা'আর আকীদা হল– তিনি নবী-পরিবারের। তিনি কেয়ামতের পূর্বে আসবেন। তাঁর ব্যাপারে নবীজীর হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আমরা এ বিষয়ে এখানে কোনো আলোচনা করবো না।[১১০] উলূমুল হাদীসকে আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাস্তবতার বিপরীত শুধু যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করেছেন– সেটাই এখানে সংক্ষেপে বলবো।

প্রথম হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী حسنٌ صحيحٌ বলেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটির বেলায় বলেছেন حسنٌ। ইমাম তিরমিযী কথা বলেছেন বাস্তবতার আলোকে। অর্থাৎ এসব বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে কালাম থাকলেও এখানে এই হাদীসে বর্ণনাকারীর ভুল হয় নি। যায়দ আল-'আম্মীর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কালাম ইবনে 'আশূর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যতটুকু উল্লেখ করেছেন এর চেয়েও বেশি। ইমাম তিরমিযী

---

১০৯ ***তাহকীকাতুন ওয়া-আনযারুন ফিল কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ*** পৃ. ৫৬-৫৮

১১০ এ জন্য পড়ুন ড. আলী মুহাম্মাদ ছল্লাবী (হাফিযাহুল্লাহু) লিখিত ***আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যা*** পৃ. ৫১-৫৪। এই কিতাব খুলে দেখুন– তিনি উল্লেখ করেছেন, রশীদ রেযা, আহমাদ আমীন ও ফরীদ ওয়াজদীও এ ক্ষেত্রে শায মত অবলম্বন করেছেন। যার ফলে অনেক আরব আলেম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এর মুতাবি' পেয়েছেন বিধায়ই একে 'হাসান' বলেছেন। *আল-'ইলালুছ ছগীর*-এর শেষে তিনি তাঁর এ অভ্যাসের কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।(১১১)

তবে ইবনে আ'শূর ইমাম আ'ছেম বিন বাহদালা সম্পর্কে যেমনটা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায়– তাঁর মান যায়দ আল-'আম্মীর মানের চেয়েও নিম্নে! কিন্তু বাস্তবে উভয়ের মানে কোনো তুলনা হয় না। এ ছাড়া তিনি যাদের দিকে তাঁর তায'ঈফের নিসবত করেছেন সেটাও পুরোপুরি সহীহ নয়।(১১২)

---

১১১ আরো দেখা যেতে পারে ***শারহু নুখবাতিল ফিকার*** (হাসান অধ্যায়)।

১১২ ইবনে সা'দ তাকে দুর্বল বলেন নি। বলেছেন,

قالو: كان عاصم ثقةً، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه

'মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, 'আছেম নির্ভরযোগ্য। তবে ভুল একটু বেশি হয়।' ***তবাকাতে ইবনে সা'দ*** ৩/৫১৮

ইয়াকুব বিন সুফিয়ান 'আছেমকে দুর্বল বলেন নি। বলেছেন,

في حديثه اضطرابٌ، وهوَ ثقةٌ.

'তিনি নির্ভরযোগ্য। তবে তার হাদীসে কিছু বিভ্রাট রয়েছে।' **তাহযীবুত তাহযীব** ৩/৪৬৬

আবূ হাতেম রাযী কী বলেছেন দেখুন–

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح.

قال: وسألت أبا زرعة عنه، فقال: ثقةٌ، وذكره أبي، فقال: محلُّه عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولِيس محله أن يُقال: هو ثقة، ولم يكن بالحافظ، وقد تكلم فيه ابن علية، فقال: كان كل من اسمه عاصم سيِّء الحفظ.

'আব্বাজান তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, চলে। আমি আবূ যুর'আকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, নির্ভরযোগ্য। আমার বাবা বলেন, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে নির্ভরযোগ্য তো বলা যায় না। তবে চলে। তিনি হাফিযুল হাদীস ছিলেন না। ইবনে 'উলাইয়্যা বলেছেন, যার নামই 'আছেম তার স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে।' ***তাহযীব*** ৩/৪৬৬

ইবনে খিরাশও সরাসরি তাঁকে দুর্বল বলেন নি। বলেছেন,

في حديثه نكرةٌ.

'তার হাদীসে কিছু ভুল আছে।' **মীযানুল ই'তিদাল** ৩/১৭৭ ও **তাহযীব** ৩/৪৬৬

অন্যান্যদের কথাগুলো উক্ত দুই কিতাবে আমরা মুরাজা'আত করতে পারি। এখানে আমরা শুধু হাফেয আবূ বকর বায্যার ও হাফেয যাহাবীর একটি করে বক্তব্য উল্লেখ করেই এ দীর্ঘ টীকাটি শেষ করবো।

হাফেয আবূ বকর বায্যার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

لم يكن بالحافظ، ولا نعلم أحدًا ترك حديثه على ذلك، وهو مشهور.

'তিনি হাফেয ছিলেন না। তবে এ জন্য কোনো মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস তরক করেন নি। বিষয়টি প্রসিদ্ধ। (কিংবা বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ)।' **তাহযীব** ৩/৪৬৭

হাফেয যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

আফসোস, ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তা'লীলুল হাদীসের মত এত সুগভীর ও স্পর্শকাতর বিষয়কে একেবারেই 'অটো' ভেবেছেন! তিনি মনে করেছেন- কারো ব্যাপারে জার্হ ওয়া তা'দীলের কিতাবে তাযঈ'ফ পেলে তা ঐ রাবীর যে কোনো হাদীসের ব্যাপারেই প্রয়োগ করা যাবে!! তাই তো তিনি হাফেয আবদুর রায্যাক বিন হাম্মাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মত সর্বসম্মত একজন মুহাদ্দিসের ব্যাপারেও কালাম করে বসেছেন!!! এভাবে সব কালামই যদি ধর্তব্য হয় ছাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে বুখারী-মুসলিম পর্যন্ত কেউ কি পার পাবে?! [১১৩]

দেখুন ইয়াহইয়া বিন মা'য়ীন (মৃত ২৩৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মত একজন মুতাশাদ্দিদ নাকেদ আবদুর রায্যাকের ব্যাপারে কী বলেন?

قال الحاكمُ: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الجرجاني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري، قال: سمعت أبا صالح محمد بن إسماعيل الضِّرَارِيَّ يقول: بلَغَنا – ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق/-: أنَّ أصحابنا يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق، وكرهوه، فدخلَنَا من ذلك غمٌّ شديدٌ، وقلنا: قد أنفقنا، ورحلْنا، وتعبنا، وآخرَ ذلك سقطَ حديثُه؟! فلم أزَلْ في غمٍّ من ذلك إلى وقت الحج، فخرجتُ من صنعاء إلى مكة، فوافقتُ بها يحيى بن معين، وقلتُ له: يا أبا زكريا، ما الذي بلَغَنا عنكم في عبد الرزاق؟ فقال: ما هو؟ فقلنا: بلغَنا أنكم تركتم حديثه، ورغبتم عنه؟ فقال: **يا أبا صالح، لو ارتدَّ عبد الرزاق عن الإسلام، ما تركنا حديثَه.** [১১৪] انتهى.

هو حسنُ الحديث.

'তাঁর হাদীস হাসান।' **মীযান** ৩/১৭৭

যদি আমাদের কাছে থাকা *জামে' তিরমিযীর* নোসখা ছহীহ হয়ে থাকে তাহলে ইমাম তিরমিযী তাঁকে ছিকা ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন, যেমনটা মনে করেন ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ যুর'আ রাযী। তাহলে তিনি তাঁর হাদীসকে সহীহ বলতেই পারেন।

১১৩ *খামসু রাসায়িল* পৃ. ৫৯-৬৫

১১৪ *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস* পৃ. ১৩৯-১৪০ (৩২ নং অধ্যায়)।

মূলত মুহাদ্দিসীনে কেরাম একজন রাবীর ব্যাপারে কালাম করেন তার সকল হাদীস ইস্তিকরা ও যাচাই করে। কারো ব্যাপারে 'দুর্বল' বলার অর্থ এ নয়, তার সকল হাদীস দুর্বল। কেউ যদি অধিকাংশ হাদীস ভুল বর্ণনা করে তাকে তারা দুর্বল বলেন। আমরা যারা প্রতিটি হাদীস নিয়ে ইস্তিকরা করি নি, তাদের জন্য মারাত্মক ভুল হল– যে কোনো দুর্বল রাবীর একটি হাদীস দেখলে বলে বসা, হাদীসটি দুর্বল। কারণ, অমুক ইমাম রাবীকে দুর্বল বলেছেন! ইমাম তিরমিযী যখন যায়দ আল-'আম্মীর মত একজন দুর্বল রাবীর হাদীসকে 'হাসান' বলছেন, তিনি ইস্তিকরা করেই বলছেন। তিনি যখন 'আছেম বিন বাহদালার হাদীসকে 'সহীহ' বলছেন জেনেশুনে ও যাচাই-বাছাই করেই 'সহীহ' বলছেন।

এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে ইমামদের বিভিন্ন মানহাজ রয়েছে। কেউ তো আছেন কয়েকটি হাদীসে ভুল হলেই কালাম করেন। আবার কেউ আছেন তার সব হাদীসের বিবেচনায় কম-বেশি দেখে কালাম করেন। হাফেয যাহাবী তাঁর একটি স্বতন্ত্র রিসালায় এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[১১৫]

তো সারকথা হল– ইমামগণের তাহকীকের আলোকে বাস্তবতা হল, দুর্বল রাবীও এখানে ভুল করে নি। কিন্তু স্বাভাবিক যৌক্তিক কথা হল, সে তো দুর্বল। তাই তার ভুল হওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু বাস্তবতার কাছে এ যুক্তি একেবারেই অসহায়।[১১৬]

সাইয়েদ মুয়া'য্যম ছাহেবের তাহকীকে الصراري লেখা ছিল। এটা ভুল। সহীহ হল الضراري, ض দিয়ে। যবত লেখা হয়েছে হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *তাকরীব* থেকে। রাবী নিশ্চিত করা হয়েছে *তাহযীবুত তাহযীব*-কে সামনে রেখে।

১১৫ দেখুন– *আরবা'উ রাসায়েল* পৃ. ১৭১-১৭২

১১৬ এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী মনে হয়–

যে কোনো হাদীসের ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের বিপরীত মত পোষণ করা একেবারেই না-জায়েয। এটা অনধিকার চর্চার শামিল। আহলে ইলমের জন্য এখানে শুধু ইমামুল আছর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর 'ইবারতটুকু তুলেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছি :

وليُعلمْ أنَّ تحسين المتأخرين وتصحيحهم لا يُوازي تحسين المتقدمين؛ فإنهم كانوا أعرفَ بحال الرواة؛ لقرب عهدهم بهم، فكانوا يحكمون ما يحكمون به بعد تثبتٍ تامٍّ ومعرفةٍ جزئية، أما المتأخرون، فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين، فلا يحكمون إلا بعد مطالعة أحوالهم في الأوراق، وأنت تعلم أنه كم مِن فرق بين المجرِّب والحكيم؟! ...

وحينئذٍ إن وجدتَ النووي مثلاً يتكلم في حديثٍ، والترمذيَّ يحسنُه، فعليك بما ذهب إليه الترمذي، ولم يُحسن الحافظ في عدم قبول تحسين الترمذي؛ - كم لمْ يُحسِنْ أبو بكر ابن العربي وابن القطان في مخالفتهما للترمذي في تحسينه، ولا ينفعُ ابنَ القطان متابعة المحقق ابن الهمام

***

আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আরেকটি বাস্তবতা-বিরোধী বক্তব্য দেখুন। তিনি বলেন,

وقد حدثتْ في خلافة المأمون فتنةُ الخوض في أنَّ القرآن مخلوقٌ، وأُلقيت الأسئلة على كثيرٍ من أهل العلم، فكان منهم مَن أبى الجواب، ومِن هؤلاء: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد ضُربَ ليجيب، فأبى الجواب، وما كان ذلك جهلاً منه بالفصل بين الموصوف بالمخلوق والموصوف بالقديم، ولكنه علم أن المقصود ليتخذوا كلامَه وسيلةً لتأييد البدعة.

'খলীফা মামূনের যুগে খালকে কুরআনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেক আহলে ইলমকে ধরে ধরে প্রশ্ন করা হয়েছে। কেউ কেউ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানাতেন। এদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য তাঁকে প্রহার করা হয়েছে। তারপরও তিনি উত্তর দেন নি। সৃষ্ট ও আদী এ দু'য়ের পার্থক্য না জানার কারণে তিনি উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকেন নি। তবে তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাঁর কথা দিয়ে বিদ'আতের শক্তি যোগানো হবে।'[১১৭]

- فإن مبناه على القواعد، لا غير، وحكم الترمذي يُبنى على الذوق والوجدان الصحيح، وإن هذا هو العلم، وإنما الضوابط عصا الأعمى. انتهى بزيادة ما بين الشريطتين.

'জেনে রাখ, পরবর্তীদের তাসহীহ-তাহসীন পূর্ববর্তীদের তাসহীহ-তাহসীনের সমান হতে পারে না। পূর্ববর্তীরা বর্ণনাকারীদের যুগের নিকটবর্তী হওয়ায় রাবীদের সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অধিক। তারা যেটাই ফায়সালা দিতেন পূর্ণ স্থিরতার সঙ্গেই ফায়সালা দিতেন। প্রতিটি বিষয় পাই-পাই হিসাব করেই সিদ্ধান্ত দিতেন। কিন্তু পরবর্তীরা তো কিতাবের পাতায় রাবীদের অবস্থা দেখেই ফায়সালা দেয়। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ জ্ঞানীর মাঝে পার্থক্য কত বেশি– তা তো তুমি জানোই। ...
তাই তুমি যদি দেখ, ইমাম তিরমিযী কোনো হাদীসকে হাসান বলেছেন। অথচ নববী সেটার ব্যাপারে কালাম করেছেন, তাহলে তুমি ইমাম তিরমিযীর কথাই গ্রহণ করো। ইমাম তিরমিযীর তাহসীন গ্রহণ না করে হাফেয ইবনে হাজার খুব ভালো কাজ করেন নি। কারণ হলো, নববী যা বলেন কায়েদার আলোকে বলেন। আর ইমাম তিরমিযীর কথার ভিত্তি হলো শাস্ত্রীয় যাওক ও রুচির উপর। শাস্ত্রীয় যাওককেই তো ইলম বলে। কায়েদা তো হলো অন্ধের লাঠি।' *ফায়যুল বারী* ৬/২১৬
এ বিষয়ে আরো দেখা যেতে পারে ড. হামযা মালীবারী (হাফিযাহুল্লাহু)-এর *যিয়াদাতুস সিকাহ*-এর মুলহাকে, পৃ. ১১৯-১২১, হাফেয যাহাবী রচিত *আল-মূকিযা* পৃ. ৪৬ ও *শারহুল মূযিকা* পৃ. ১১২-১১৩

১১৭ *তাহকীকাতুন ওয়া আনযারুন* পৃ. ১০৬

রিজালের কিতাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এ ফিতনায় সাড়া না দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি কুরআন সম্পর্কে মোটেও কোনো কথা বলেন নি– এমনটা বোঝা ঐতিহাসিকভাবে ভুল হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই।[১১৮] সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়।

যদিও আল্লামা ইবনে 'আশূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সৃষ্ট ও আদীর যে পার্থক্যের দিকে ইশারা করেছেন তা অবশ্যই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জানার বাইরে ছিল না। কিন্তু তারপরও যারা 'আমাদের উচ্চারিত শব্দ মাখলূক। মূল কুরআন মাখলূক নয়।' বলেছেন, তাদের এ কথাকে ইমাম আহমাদ বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। যেহেতু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুস্পষ্টভাবে এ পার্থক্যকে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন, তাই যৌক্তিকভাবে এ পার্থক্য পূর্ণ সঠিক হওয়ার পরও ইমাম আহমাদকে এ পার্থক্যের পক্ষে মনে করা বাস্তবতা-বিরোধী। এ জন্য তা পরিহার-যোগ্য।

ইমাম ইবনু আবদিল বার (মৃত ৪৬৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وممن أخذ عنه أيضًا ببغداد: أبو علي الحسين بن علي الكرابيسيُّ، وكان عالِمًا مصنفًا متْقِنًا، وكانت فتوى السلطان تدورُ عليه، وكان نظَّارًا جدليًّا، وكان فيه كبرٌ عظيمٌ.

وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل صداقةٌ وكيدةٌ، فلما خالفَه في القرآن عادت تلك الصداقة عداوةً، فكان كلٌّ منهما يطعن على صاحبه، وذلك

এ কিতাবটির একাধিক বিষয় এখানে সমালোচনা করা হলেও কিতাবটি লেখকের অত্যন্ত প্রিয় কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর কিছু উত্তম দিক অন্য কোথাও আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। আল্লামা ইবনে 'আশূর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও লেখকের একজন সুপ্রিয় মুসন্নিফীনের একজন। তাঁর রচিত *আত-তাহরীর* ধারাবাহিক অধ্যয়ন করা লেখকের অত্যন্ত সুখকর আমল।

১১৮ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমাকে দুই-দুইবার পরীক্ষা করা হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে– কুরআন সম্পর্কে আপনি কী বলেন? আমি বলেছি, কুরআন আল্লাহর কালাম। মাখলূক নয়।' *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ৭/৪৯১
বরং যেসব উলামায়ে কেরাম নিজেদের ঈমান ঠিক রাখার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের ব্যাপারে শাস্তি ও হত্যার ভয়ে চুপ থাকতেন, তাদের অবস্থান ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পছন্দ করতেন না। তাদেরকে বলতেন واقفي مشئومٌ 'কুরআনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করতে অক্ষম দুর্ভাগা।' এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে লেখকের অপর রিসালা مهماتٌ من أصول الجرح-এর অষ্টম পরিচ্ছেদ।

أن أحمد بن حنبل كان يقول: من قال: «القرآن مخلوقٌ» فهو جهميٌّ، ومن قال: «القرآن كلامُ الله»، ولا يقولُ: «غير مخلوق» فهو واقفي، ومن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو مبتدعٌ.

وكان الكرابيسي، وعبد الله بن كُلاَّب، وأبو ثور، وداود بن علي، وطبقاتهم يقولون: «إن القرآن الذي تكلَّم الله تعالى به صفةٌ من صفاته، لا يجوز عليه الخلقُ.

وإن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسبٌ له وفعلٌ له، وذلك مخلوق، وإنه حكايةٌ عن كلام الله، وليس هو القرآن الذي تكلم الله به»، وشبهوه بالحمد والشكر لله.

'বাগদাদে আরও যারা ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন– আবূ আলী হুসাইন বিন আলী কারাবীসী। তিনি ছিলেন লেখক, গবেষক। বাদশাহর ফতোয়া তিনিই প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন তার্কিক পর্যায়ের ইমাম। তবে তাঁর মাঝে বেশ অহঙ্কার ছিল।

তাঁর মাঝে ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাঝে বেশ মধুর বন্ধুত্ব ছিল। কুরআনের বিষয়ে যখন উভয়ের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল সে বন্ধুত্ব তখন শত্রুতায় পরিণত হল। উভয়ের প্রত্যেকেই তার বন্ধুকে জারহ করতো।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলতেন, যে বলবে, কুরআন মাখলূক সে জাহমী। আর যে শুধু 'কুরআন আল্লাহর কালাম' বলে ক্ষ্যান্ত থাকবে সে 'ওয়াকিফী'। 'আমার উচ্চারিত কুরআন মাখলূক' যে বলবে সে বিদআতী।

কারাবীসী, আবদুল্লাহ বিন কুল্লাব, আবূ ছাওর, দাউদ বিন আলী ও তাদের তবকার উলামায়ে কেরাম বলতেন, যে কুরআন আল্লাহর কালাম সেটা তাঁর ছিফাত। সেটাকে মাখলূক বলা কখনোই বৈধ নয়। তবে তিলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত তো তার কর্ম। সেটা মাখলূক। সেটা মূলত কালামুল্লাহ নয়। বরং

কালামুল্লাহর হেকায়েত। তারা এটা আল্লাহ তা'আলার হামদ ও শোকরের সঙ্গে তাশবীহ দিয়েছেন।'[১১৯]

হাফেয যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

قال حسين في القرآن: لفظي به مخلوقٌ، فبلغَ قولُه أحمدَ، فأنكره وقال: هذه بدعة، فأوضح حسينٌ المسألة، وقال: تلفظُك بالقرآن.

ولا ريبَ أن ما ابتدعه الكرابيسي، وحرَّره في مسألة التلفظ، وأنه مخلوقٌ= هو حقٌّ، لكن أباه الإمام أحمد؛ لئلا يُتذَرَّع به إلى القول بخلق القرآن.

'হুসাইন বিন আলী কারাবীসী (মৃত ২৪৫ হি.) বলেন, আমার উচ্চারিত শব্দ মাখলূক। তাঁর এ কথা আহমাদ বিন হাম্বলের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, এটা বিদ'আত। তখন কারাবীসী তাঁর মতকে সুস্পষ্ট করে বলেন, আমি কুরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে যে শব্দ উচ্চারণ করছি সেটা সৃষ্ট।

কোনো সন্দেহ নেই– কারাবীসী যেটা বলেছেন সেটাই সত্য। তবে ইমাম আহমাদ সেটাকে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন, যাতে করে এর মাধ্যমে কুরআনকে মাখলূক বলার পথ তৈরী না হয়।'[১২০]

***

কখনো এমন হতে পারে– এক জামাত উলামায়ে কেরাম একটি মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে সেটা বাস্তবতার বিপরীত। পৃথিবী যত উন্নত হবে কুরআনের অলৌকিকতা ও বাস্তবতা ততই প্রকাশ পেতে থাকবে। একটি উদাহরণ দেখুন :

বাদশাহ যুলকারনাইন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রাচীর নির্মাণ করে বলেছিলেন,

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾

---

১১৯ *আল-ইনতিকা* পৃ. ১৬৫ (ইমাম শাফে'য়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনীর শেষে।)

১২০ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ৮/৩৮-৩৯ (কারাবীসীর জীবনী-অংশ)। আরও দেখা যেতে পারে *তাহযীবুত তাহযীব* ২/২১০-২১১

'অনন্তর যখন আসবে আমার রবের ওয়াদা, বানাবেন তিনি তা-কে (ভূমির মতো) সমতল।'[১২১]

ওয়াদা বলে এখানে কোন সময় বোঝানো হয়েছে? 'এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্বযুগের অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন, "আমার রবের ওয়াদা" বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেহেতু কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে وَعْدٌ শব্দ বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে, তাই তারা এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তবে এ তাফসীর অকাট্য নয়। বরং ধারণাপ্রসূত।

এখন পর্যন্ত ভৌগলিক যাচাই-বাছাই ও গবেষণা থেকে ধারণা হয়, হযরত যুলকারনাইন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নির্মিত প্রাচীর বহু আগেই ভেঙ্গে গেছে। এটাও ধারণাপ্রসূতই। সুনিশ্চিত নয়। এ সত্ত্বেও যার আকলী ও নকলী দালায়েল মুওয়াযানা করার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন– ভৌগলিক গবেষণাকে কেন্দ্র করে গৃহীত মতটি প্রথম স্তরের যন্নী। আর উপরে উল্লেখিত তাফসীরটি দ্বিতীয় স্তরের। তাই বলা যায়, আয়াতে "আমার রবের ওয়াদা" বলে নির্দিষ্ট যে কোনো একটি সময় বোঝানো হয়েছে। কেয়ামত নয়। এ জন্যই ইমামুল আছর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) পূর্ববর্তী সকল মুফাসসিরের বিপরীতে এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।'[১২২]

***

কখনো এমন হয়– যুগ-পার্থক্যের কারণে কুরআনের ভিন্ন একটি অর্থ বুঝে আসছে। তবে পূর্ব-যুগের মুফাসসিরগণ যে অর্থ বলেছেন সেটাও সঠিক হতে পারে। একটি উদাহরণ দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারে বলেন,

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾

'সৃষ্টি করেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদরে সৃষ্টির পর সৃষ্টি তিনটি অন্ধকারের ভেতর।'[১২৩]

'তিনটি অন্ধকার'-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, উদর, রেহেম ও নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তার সঙ্গে থাকা আবরণ।[১২৪]

---

১২১ **সূরা কাহ্ফ, আয়াত নং : ৯৮**

১২২ ***উলূমুল কুরআন***, **হযরত শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম পৃ. ৪২৬-৪২৭**

১২৩ **সূরা যুমার, আয়াত : ৬**

বর্তমান চিকিৎকসা-বিজ্ঞান তিনটি আবরণ আবিষ্কার করেছে, যেগুলো বিশেষ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। আবরণগুলো দিয়ে যদি অন্ধকার সৃষ্টি হয়, তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যায় এই আবিষ্কার উল্লেখ করা যেতে পারে।[১২৫]

এ কথাটি এ জন্য হলো যে, অনেকেই কুরআন মাজীদের আয়াতকে টেনে-হেঁচড়ে বিজ্ঞান সাব্যস্ত করতে চান। এটা ভুল। কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়। হ্যাঁ, কুরআন যেহেতু সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম, যিনি পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব থেকেই কেয়ামত তক পৃথিবীতে কী কী ঘটবে সবই জানেন, তাই অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁর পাক কালামে সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উঠে আসতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়।

এ ক্ষেত্রে আমাদের এ নীতিও মনে রাখতে হবে– যে কোনো বিষয় আমার নাকেস বুঝ অনুযায়ী কুরআন মাজীদের খেলাফ মনে হলেই তাকে মিথ্যা বা ভুল সাব্যস্ত করা যাবে না। বুঝমান উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেই ভুলের সিদ্ধান্ত দিবো। ***ইস্তেম্বাত করে পড়ুন*** শিরোনামে যমীন গোলাকার হওয়ার বিষয়ে আবূ আলী জুব্বাঈ, আবুল কাসেম বালখী ও জালালুদ্দীন মাহাল্লীর বক্তব্য আমরা পড়ে এসেছি।

১২৪ *তাফসীরে ইবনে কাসীর* ৪/৫৭ ও *তাফসীরে উসমানী* ২/৯৯১

১২৫ *আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী পৃ. ১৯৭
এ বিষয়ে এখনো লেখকের খটকা রয়েছে। যৌক্তিকভাবে মনে হচ্ছে– যেসব আবরণগুলো এতটা পাতলা যে, বিশেষ যন্ত্র ছাড়া তিনটি আবরণ একটি মনে হয়, সেগুলো দ্বারা বিশেষ অন্ধকার সৃষ্টি হতে পারে না। মুহাক্কিক কোনো ডাক্তারের খোঁজ করছি, যিনি এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন। ইলমে তিব্বে যেহেতু আমাদের রায় অগ্রহণযোগ্য তাই শুধু যৌক্তিক খটকাটা উল্লেখ করা হল।

পড়ার স্তর বুঝুন

পড়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাফাক্কুহ অর্জন করতে হলে সেগুলো অবশ্যই বুঝে বুঝে অতিক্রম করতে হবে। নাকিস তালিবে ইলম হিসেবে পড়ার কিছু স্তর লেখকের বুঝে এসেছে। আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাইদের সামনে সেগুলো পেশ করা হল :

প্রথম মারহালা :

প্রথমে যে কোনো লেখকের ভাষা বুঝতে হবে। এর অধীনে কিছু কথা আমাদের মনে রাখা জরুরী :

- প্রতিটি শব্দের অর্থ না জেনে দয়া করে সামনে অগ্রসর হবেন না। অনেক সময় আগ-পর দেখে শব্দের অর্থ বুঝে এসে যায়। কিন্তু তার পরও শব্দটি অভিধানে না দেখে অগ্রসর হবেন না। এটা তো ইলম নয়। এর নাম যন। ইলম তো সেটা যা হৃদয়কে প্রশান্ত করে। ধারণাভিত্তিক কোনো জানাশোনা হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারে না। রুসূখের জন্য এক অভিধান মুরাজা'আতও যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসছে।
- যদি একটি শব্দের ব্যাখ্যা অন্য শব্দ দিয়ে করা হয়, তাহলে অবশ্যই দুই শব্দের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন। বিশেষত আরবীভাষার মুহাক্কিক ভাষাবিদ ইমামগণ বলেছেন, এতে কোনো মুরাদিফ শব্দ নেই।
- আপনি হয়তো পেয়েছেন (جسم)-এর অর্থ (بدن)। এবার আপনি আরো অভিধান দেখে শব্দ দু'টির পার্থক্য নির্ণয় করুন। অভিধান ঘাঁটলে আপনি পেয়ে যাবেন– মাথা ও হাত-পা ব্যতিত শুধু কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত অংশকেই بدن বলা হয়।[১২৬]
- (قصم) শব্দটির অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক অভিধানে শুধু (قطع) বা (إهلاك) লেখা হয়েছে। অথচ আপনি অন্যান্য অভিধান মুরাজা'আত করলে পাবেন– এই শব্দটির আরো দু'টি অতিরিক্ত অর্থ আছে। এক. কোনো মজবুত

---

১২৬ **আল-মুগরিব ১/৬৩**

ও শক্তিশালী কিছু কাটা ও ধ্বংস করা। দুই. এমনভাবে কাটা যে, কর্তিত দুই অংশ সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে যায়। এই শব্দের হাকীকত না বুঝে কুরআনুল কারীমের তরজমা করলে তরজমা সহীহ হবে কী করে বলুন? কিন্তু এমন তরজমা কি আজ আমাদের সমাজে কম?

- আপনি ফিকহের কিতাবের শব্দ খোঁজার জন্য প্রথমেই **আল-মুগরিব** বা **আল-মিসবাহুল মুনীর** দেখবেন না। বরং **আস-সিহাহ** ও অন্যান্য অভিধান দেখুন। কয়েকটি অর্থ দেয়া থাকলে নিজের চেষ্টা ও চিন্তার মাধ্যমে উপযুক্ত অর্থ নির্ণয় করুন। এর পর ফিকহী কিতাবের অভিধান মুরাজা'আত করে দেখুন, আপনার বুঝ ঠিক আছে কি না। এভাবে অল্প সময়েই ফিকহুল ফনের অত্যন্ত মজবুত যোগ্যতা হাসিল হতে পারে। তবে শর্ত হল– ইনসাফ থাকতে হবে। ইমামগণের মত যদি নিজের মতের বিপরীত হয়, তাহলে আপাতত ইমামগণের মতই গ্রহণ করতে হবে। এর পর তালিবে ইলম বড় হলে আরো কিতাব মুরাজা'আত করে দেখবে, কোথাও কোনো ইমাম এমন বলেছিলেন কি না?

- একই অভিধানে সব সময় রাজেহ অর্থ দেয়া থাকে না। তাই অন্যান্য অভিধানও মুরাজা'আত করুন।

দ্বিতীয় মারহালা :

দ্বিতীয় মারহালায় আমাদের কর্তব্য হল, লেখকের কথা ভালোভাবে বোঝা। এখানেও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন :

- প্রথমে দেখুন, লেখকের কথায় কোনো ইছতিলাহী শব্দ আছে কি না। থাকলে এর পারিভাষিক অর্থ নিশ্চিতরূপে জেনে নিন। 'আবদে মাযূন'-এর অর্থ কেউ কেউ মনে করে, বিবাহের ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত। ***উসূলুশ শাশী*** ও ***মুখতাসারুল কুদূরী*** পড়ার পরও আমরা এত সোজা পরিভাষাটা বুঝি না। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। আমীন।

- প্রত্যেক লেখকেরই কিছু নীতি থাকে। লেখক কিতাব রচনার ক্ষেত্রে ওসব নীতি ও চিন্তা সামনে রেখেই কিতাব রচনা করেন। লেখকের এসব নীতি বোঝার জন্য আমাদের উচিত– কিতাবের একটি বিরাট অংশ পড়া। তাহলে অনেকটা নিশ্চিত বোঝা যাবে। এক-দু'টি মাসআলা পড়ে হয়ত বোঝা যায়, কিন্তু ভুলের সম্ভাবনা আছে।

  বিশেষত আমাদের নেসাবে পঠিত হাদীসের কিতাবগুলোর লেখকগণ নিজেদের নীতি সুস্পষ্ট বলে যান নি। তাই এ নিয়ে অন্যদের যথেষ্ট

ইখতেলাফ হয়েছে। কেউ সৎ ধারণার ভিত্তিতে এমন কিছুকে ইমাম বুখারীর শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যা মূলত ইমাম বুখারীর শর্ত নয়।

কেউ অপূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে বলেছেন, 'ইমাম বুখারী ইমাম যুহরীর ছাত্রদের দ্বিতীয় তবকা থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন না।'[১২৭] অথচ সহীহ বুখারীতে তাদের অনেক হাদীস রয়েছে। কিতাবের মূল অংশে নেই বলেও পার পাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, কিতাবের মূল অংশেও তো আছে!

আবার কেউ বলেছেন, 'ইমাম বুখারী হাসান হাদীস দিয়ে দলিল দেন না।'[১২৮] হয়ত মনে করেছেন, তিনি সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। তাহলে তিনি তো হাসান মানেন না। অথচ আমরা যেভাবে সহীহ ও হাসানের মাঝে ভাগ করি, ইমাম বুখারীর সময় তো এভাবে ভাগও করা হতো না।[১২৯] ইমাম তিরমিযী এমন কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর তাহসীন নকল করেছেন, যেগুলো ইমাম বুখারী নিজেও ***আল-জামি'উস সহীহ*** গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১৩০] মূলত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইছতিলাহী ছহীহ' অনুযায়ী তাঁর ***সহীহ*** গ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তিনি ব্যাপক অর্থে সহীহ হাদীস সংকলনের জন্য এ কিতাব রচনা করেছেন। যে সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা হল– দলিলযোগ্য সকল হাদীস।

কারো অনুসন্ধান যদি সঠিকও হয়, তাও বুঝে-শুনে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, অনুসন্ধানমূলক ফায়সালাগুলো অধিকাংশের ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে।

ইবনুল ফারাস আন্দালুসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সচেতনতা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন,

قال مجاهدٌ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ حيثُ وقع من القرآن مكيٌّ، و﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ مدني.

---

১২৭ ***শারহু ইলালিত তিরমিযী*** ১/৩৯৯

১২৮ ***নাইলুল আওতার***, আল্লামা শাউকানী লিখিত (ভূমিকা-অংশ)। হযরত মাওলানা নু'মানী (মৃত ১৪২০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি শাউকানীর মুতাবা'আত করেছেন। ***আল-ইমামু ইবনু মাজাহ ওয়া-কিতাবুহুস সুনান*** পৃ. ৮১

১২৯ ***নাযারাতুন জাদীদা*** ড. হামযা আবদুল্লাহ মালীবারী পৃ. ২৮

১৩০ ***নাযারাতুন জাদীদাতুন ফী 'উলূমিল হাদীস*** পৃ. ২৫ ও ২৬

وهذا الذي قاله مجاهدٌ صحيحٌ في ﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ﴾، وأما ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ فقد يجيءُ في المدني[১৩১].

তিনি হযরত মুজাহিদের ইস্তেকরার উপর আপত্তিও করেন নি। আবার নিজের তাহকীক ও অধ্যয়ন ব্যতিত কথাটি মেনেও নেন নি। তিনি অধ্যয়ন করে ইস্তেসনা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

- কখনো লেখকের কথা বোঝার জন্য তার সময়ের ইতিহাস জানতে হয়। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'খলীফা-পরিবার সাধারণ সব কুরাইশের কুফু হবে না।' শাইখুল ইসলাম মারগীনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'তিনি হয়ত এটা ফিতনা দমন করার জন্য বলেছেন।' অর্থাৎ মূলত তারা অন্যান্য কুরাইশের কুফু হবে।

- অনেক সময় বিভিন্ন ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন প্রথম শতাব্দীতে কিছু লোক ছাড়া সব শিয়াদের আকীদা ছিল স্বাভাবিক পর্যায়ের। অনেকে তো শুধু হযরত আলীকে উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। আবার কেউ কেউ শাইখাইনের উপরও প্রাধান্য দিতেন। অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যমানার পরিবর্তনে তাদের আকীদায় অনেক পরিবর্তন আসে। এখন যারা আছে তাদেরকে 'ইসনা আশারিয়্যা' গ্রুপ বলে। তাদের আকীদা কুফুরি আকীদা।[১৩২]

  প্রাচীন যুগে কিছু ভণ্ডদেরকে ইমাম আবূ বকর আল-জাস্‌সাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি ***শারহু মুখতাসারিত তহাবী*** গ্রন্থে কারামিতিয়্যা বাতিনিয়্যাহ বলেছেন। আমাদের যুগের দেওয়ানবাগীরা আজ সে কাজই করছে।

- কখনো লেখকের 'ইবারতের মর্ম-উদ্ধার খুব কষ্টকর হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা একটা মারাত্মক ভুলের শিকার হই। আমরা প্রথমেই কোনো শরাহের সাহায্য গ্রহণ করে ফেলি। বাংলা-উর্দূ শরাহ দেখা তো বিষ পানের মত। আশা করি, কোনো 'তালিবে ইলম' তা করবেন না। তাই সে বিষয়ে কিছু বলা হচ্ছে না।

---

১৩১ **আহকামুল কুরআন** ১/৩৭ (সূরা বাকারার শুরুতে)।

১৩২ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম থেকে শ্রুত। একটি বিশেষ মজলিসে হযরত মাওলানা এ কথা বলেছিলেন।

- যদি বুঝে না আসে, তাহলে একবার নয় বারবার চেষ্টা করুন। বারবার চেষ্টার পর বুঝে না আসলে কিতাব আপাতত রেখে দিন। ইস্তেগফার করুন। লেখকের জন্য দোয়া করুন। দুরূদ শরীফ পড়ুন। এরপর আবার চেষ্টা করুন। ইনশা-আল্লাহ হল্ হয়ে যাবে।

- এখন প্রায় সব কিতাবের সঙ্গেই বিভিন্ন টীকা যুক্ত রয়েছে। কিছু কাল আগেও এটা ছিল না। বিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ টীকাযুক্ত কিতাব পড়ানো ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।[১৩৩]

- লেখকের কথায় যদি বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে একটি অর্থ নির্ধারণ করতে হবে। কখনো দেখা যায়– বাহ্যত দৃষ্টিতে একটি অর্থ বুঝে আসে। সেটা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। অথচ এ বাক্যের আরেকটি সূক্ষ্ম অর্থও রয়েছে। আর সেটাই লেখকের উদ্দেশ্য। একটি উদাহরণ দেখুন–

ফিকহের মতনে আছে,

لو زوَّج المولى عبدَه امرأةً، وهو مأذون له، ساوتْ المرأةُ غرماءَه في مهر مثلها.

এ বাক্যের 'মহরে মিছিল'-এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

- নফসে মহরে মিছিলই উদ্দেশ্য। যদি নফসে মহরে মিছিল হয়, তাহলে মহরে মুসাম্মা দিয়ে বিবাহ হলে মহিলা পাওনাদারদের সঙ্গে শরীক থাকবে না। এমনকি যদি তার মহরে মুসাম্মা মহরে মিছিলের সমপরিমাণও হয়।

- উদ্দেশ্য নফসে মহরে মিছিল নয়। বরং মহরে মিছিলের পরিমাণ। এটা বাহ্যত দূরবর্তী ব্যাখ্যা মনে হলেও এটাই হল উদ্দেশ্য। কারণ, মহরে মিছিল দ্বারা তো উদ্দেশ্য– কোনো মহিলাকে তার মত অন্য

---

১৩৩ এটি বিশেষভাবে আরবী সাহিত্যের কিতাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোনো তালিবে ইলমের ক্ষেত্রে উস্তাদ অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োগ করতে পারেন। নেসাব তো হয় উস্তাদের ইজতিহাদের উপর। যিনি এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধলবী (মৃত ১৩৩৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মুজতাহিদানা রায় দিতে না পারেন, তার জন্য ছাত্র গড়া অসম্ভবই। *আপবীতী* এবং আলী নাদবীর (মৃত ১৪২০ হি.) *সাওয়ানেহে হযরত শাইখুল হাদীস* গ্রন্থে হযরতের তরীকায়ে তাদরীস দেখা যেতে পারে।

কোনো মহিলার মহরের পরিমাণ থেকে কম না দেয়া। তাহলে এখানেও পরিমাণের বিষয় আছে। তাই মহিলার মহরে মুসাম্মা যদি মহরে মিছিলের সমান হয়, তাহলে মহিলা অন্যান্য পাওনাদারদের সঙ্গে শরীক থাকবে। আর যদি কম হয়, তাহলে তো শরীক থাকার বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট। ফিকহের শুরূহে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।[১৩৪]

তাই তালিবে ইলম ভাইদের জন্য কর্তব্য হল, প্রথমে নিজে চিন্তা-ফিকির করে একটি অর্থ নির্ণয় করা। এর পর মাবসূত কিতাবাদিতে তালাশ করা। যদি আপনার বুঝের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে তো আল-হামদুলিল্লাহ। আর না মিললে, আপনার ভুলের কারণ নির্ণয় করুন এবং সামনে যেন এমন ভুল না হয়, লক্ষ্য রাখুন।

লেখকের কথা বোঝার ক্ষেত্রে এটাও মনে রাখতে হবে– লেখক কথাটা একান্ত তার যুগের কোনো অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন কি না। যেমন ইমাম মারগীনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'কাপড় কীমী'। অথচ আমাদের যুগে কাপড় মিছলী হয়ে গেছে।

ইমাম ছাহেব ও তাঁর শাগরেদদ্বয়ের মাঝেও এমন কিছু মাসায়েলে ইখতেলাফ হয়েছে, যেগুলো সম্পূর্ণ যুগ ও অবস্থা-নির্ভর। কেউ যদি ঐ মূল কারণটা না জানে, তাহলে এটাকে হাকীকী ইখতেলাফ মনে করবে। অথচ এটা ইখতেলাফ নয়।[১৩৫]

- লেখকের কথা থেকে ইস্তেম্বাত করুন। পাঠক যদি শুধু শাব্দিক অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার পক্ষে নিজে কিছু বোঝা সম্ভব হবে না। একটি উদাহরণ দেখুন :

قال الإمام المرغيناني نقلاً عن الإمام مُحَمَّد رحمهما الله تعالى: «وإذا كانت الحرةُ تحتَ عبدٍ، فقالت لمولاه: أعتِقه عني بألف، ففَعَل، فسد النكاحُ»؛ للتنافي بين المِلكَينِ.

---

১৩৪ *তাবয়ীনুল হাকায়েক* ২/৫৮৯

১৩৫ ***ইলমী মতানৈক্যে আমাদের করণীয়***, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তফা (তৃতীয় অধ্যায়, 'সব ইখতিলাফ মতবিরোধ নয়' শিরোনামে)। কিতাবটি এখনো অপ্রকাশিত।

ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'যদি স্বাধীন মহিলা কোনো গোলামের স্ত্রী হয়। আর মহিলা স্বামীর মুনীবকে বলে, তাকে আমার পক্ষ থেকে আযাদ করে দিন। মুনীব আযাদ করে দিলে তাদের উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, উভয় মালিকানায় বৈপরিত্য রয়েছে।'

উক্ত সূরতের মাফহূম হল– যদি কোনো বাঁদি কোনো স্বাধীন পুরুষের স্ত্রী হয়। আর স্বামী স্ত্রীর মুনীবকে বলে, তাকে আমার পক্ষ থেকে আযাদ করে দিন। মুনীব আযাদ করলে বিবাহ নষ্ট হবে না। ফিকহের কিতাবে সাধারণত মাফহূমে মুখালিফ ধর্তব্য হলেও এখানে এই মাফহূম ধর্তব্য নয়। ছাহিবুল *হিদায়া*র তা'লীল থেকেই আপনি এটা ইস্তেম্বাত করতে পারবেন। তিনি বলেছেন, للتنافي بين الملكَينِ।

তেমনি 'একহাজার'-এর মাফহূমও এখানে উদ্দেশ্য নয়। উপরোক্ত তা'লীল থেকে আপনি একথাও বুঝতে পারছেন– আশা করি। পূর্বে উল্লেখিত হযরত ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'ইবারত থেকে আমরা আরো ইস্তেম্বাত করতে পারবো–

১. স্বাধীন ও পরাধীনের মাঝে বিবাহ-সম্পর্ক বৈধ।
২. মহিলা মালের মালিক হতে পারে।
৩. নিজের মালে আকেলা মহিলার তাসার্‌রুফ বৈধ
৪. বালেগা মহিলা নিজের কাজে কাউকে ওকীল নিযুক্ত করতে পারে।
৫. কোনো সম্পর্ক বাতিল হওয়ার জন্য শুধু মুখে ঘোষণা দিয়েই বাতিল করতে হয়– এমন নয়। রবং এর মুনাকিয কিছু করলে এমনিতেই বাতিল হয়ে যায়। আমাদের ওরফও এ নীতির আলোকেই চলে।

- লেখকের কথায় অনেক সময় একটি মাসআলাতেই একাধিক মত থাকতে পারে। কোনো কোনো লেখক তো সুস্পষ্টই তারজীহ দিয়ে দেন। আবার কোনো লেখক প্রচ্ছন্নভাবে তারজীহ দেন। লেখকের কথা দেখে সঠিক মতটি তানকীহ ও তাহরীর করতে পারা অনেক বড় যোগ্যতার ব্যাপার।

- লেখকের কথা বোঝা প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় মারহালায়) আমাদের শেষ আলোচনা হল– লেখকের বিস্তারিত কথাকে তানকীহ করে সংক্ষেপে বোঝা ও বলার চেষ্টা করুন। বিভিন্ন মাসআলায় লেখকের উৎস খুঁজে সেগুলোকে একই সুতোতে গেঁথে রাখার চেষ্টা করুন। ফিকহের কিতাবে এর অহরহ উদাহরণ রয়েছে। একই সুতোতে কিতাবের মাসায়েল গাঁথার

যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে বুঝবেন– হাফেয ইবনুস সালাহ (মৃত ৬৪৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর **মুকাদ্দিমা** একই সুতোতে গাঁথা নেই।[১৩৬] যার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন ড. মালীবারীর উল্লেখিত গ্রন্থ ও তাঁরই রচিত *আল-হাদীসুল মা'লূল কাওয়ায়েদ ও যাওয়াবেত*।

তৃতীয় মারহালা :

লেখকের কথা বোঝার পর তৃতীয় মারহালার দিকে এগিয়ে যান। এখানেও নিম্নোক্ত স্তরগুলো লক্ষ্য রেখে পড়ুন :

- লেখকের কথা বারবার বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে হবে– লেখকের কথা পরস্পর বিরোধী হচ্ছে কি না? লেখক এ কিতাবে কিংবা অন্য কোনো কিতাবে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন কি না? মোটকথা লেখকের কথা শুধু লেখকের বক্তব্যকে সামনে রেখেই বোঝার চেষ্টা করবেন– লেখকের কথা ঠিক কি না?

- এর পর শুরূহ-হাওয়াশী দেখুন। তবে বেছে বেছে ভালো ভালো শরাহ দেখার চেষ্টা করুন। 'মুফাক্কিহ' ও 'মুফীদ' শরাহগুলো দেখুন। যেসব শরাহতে তাফকীহ বা উল্লেখযোগ্য ইফাদার কাজ হয় না, সেগুলো দেখা থেকে বিরত থাকুন। শরাহতে খুঁজে দেখুন শারেহ কোনো ইশকাল করেছেন কি না? শারেহ ইশকাল করলেও মেনে নিবেন না। বরং আপনি নিজে বারবার ভেবে দেখুন– শারেহীনের ইশকাল ঠিক আছে কি না? শারেহীনের ইশকালও তো ভুল হতে পারে। মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মত এত বড় ইমামের ইশকালও মুহাক্কিকীনে কেরাম মেনে নেন না। তাহলে অন্যদের ব্যাপারটা কেমন হতে পারে?

- লেখকের কথা যদি সঠিক বা বেঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে পাঠকের উচিত, সঠিক বা বেঠিক হওয়ার মূল কারণ খুঁজে বের করা। সব সঠিক বা ভুল কথাই নির্দিষ্ট কিছু নীতির আলোকে পরিচালিত হয়। চিন্তা করে সেই নীতিটা আপনাকে ধরতে হবে। উদাহরণস্বরূপ– ভুল হওয়ার একটা কারণ হল, তাড়াহুড়া। বড় বড় শারেহীনও কখনো কখনো এ দুর্বলতার শিকার হয়েছেন।

---

১৩৬ ***যিয়াদাতুস সিকাহ ফী কুতুবি মুছত্বলাহিল হাদীস***, ড. হামযা আবদুল্লাহ মালীবারী পৃ. ৭-৮ (ভূমিকা-অংশ)।

একটি উদাহরণ দেখুন। ইমাম কুদূরী সওম অধ্যায়ে ইতিকাফের আলোচনার শুরুতে বলেন,

الاعتكافُ مستحبٌّ.

ইমাম মারগীনানী এর উপর ইশকাল করে বলেন,

والصحيحُ أنه سنةٌ مؤكدةٌ.

বাস্তবতা হল– ইমাম কুদূরী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সময়ে ইছতিলাহগুলো ততটা মুনাক্কাহ ছিল না, যতটা ইমাম মারগীনানীর সময়ে হয়েছে। ওযুর মাসায়েলের ক্ষেত্রেও তিনি মুস্তাহাব বলে সুন্নাত বুঝিয়েছেন। ইমাম কুদূরীর সমযোগী ইমাম, কাযী আবূ যায়দ দাবূসী রচিত ***তাকবীমু উসূলিল ফিকহ*** গ্রন্থটি পড়লেও ইছতিলাহ বিষয়ে এ জ্ঞান লাভ করা যায়।

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম উভয়ের উপর ইশকাল করে বলেন,

والحقُّ خلافُ كل من الطريقين، بل الحق أن يُقال: الاعتكاف ينقسم إلى واجب، وهو المنذور تنجيزًا أو تعليقًا، وإلى سنة مؤكدةٍ، وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإلى مستحب، وهو ما سواهما.

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি মোটেও খেয়াল করেন নি– লেখকের আলোচ্যবিষয় হল রমাযানের শেষ দশকের ইতিকাফ। ইমাম মারগীনানীর দলিল পেশের আন্দায থেকে তো বিষয়টা স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনি বলেন,

لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنة.

- শেষ যমানার লেখকদের কিতাব পড়তে গেলে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, তারা অনেকে নির্দিষ্ট উসূল ও মানহাজ সামনে রেখে কিতাব রচনা করেন না। এ জন্য চিন্তাশীল পাঠক তাদের কিতাবে তথ্যে নয়, বরং

চিন্তায়ও যথেষ্ট তানাকুয বা স্ববিরোধিতা দেখতে পান। আপনি পূর্বসূরিদের কিতাবে সাধারণত এমন পাবেন না।

একটি উদাহরণ দেখুন :

একজন আদর্শ লেখক বলেছেন, "'দুশ্চিন্তা বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।" এই বাণীর নিচে যদি পশ্চিমা কোনো বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের নাম লেখা থাকে, তাহলে অনেকে শিহরিত শব্দে 'ওয়াও ওয়াও' করে উঠবে। কী দারুন সত্য কথা! এমন করে যে তারা বলতে পারেন! যদি বলি, এ বাণী ডেল কার্নেগি, রবিন শর্মা, এপিজে আবদুল কালামের[১৩৭] কিংবা কোনো নামকরা মনোবিজ্ঞানীর, তাহলে সবাই বলবে– অসাধারণ তো! এ জন্যই তো তাদের বই মিলিয়নে-মিলিয়নে বিক্রি হয়। নিখাদ মুগ্ধতায় তাদের প্রশংসা করবে। নিজেদের ভুবনে তাদের স্বাগত জানাবে।
কিন্তু যদি বলি, এটি হাদিসের বাণী, তখন কি করবে জানেন? ভ্রুকুঞ্চিত ভঙ্গিতে বলবে– 'ও! কোনো ওয়াজে মনে হয় শুনেছিলাম। অবাঞ্ছিত পরমুগ্ধতা ভিমরুলের মতো আমাদের ছেঁকে ধরেছে। ঘরের সম্পদ হাতের কাছে ঢের পড়ে আছে। একটু হাত বাড়ালেই আঁচলভরে নিতে পারব, কিন্তু এগুলোকে মনে হয় খুব সস্তা, খড়কুটোর স্তূপ।'

আফসোস, কয়েক পৃষ্ঠা পরই লেখক আমাদের দাওয়াত দিচ্ছেন– আমরা যেন বিবেকানন্দ ও নিউটন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি! নেতিবাচকতাকে ইতিবাচকতায় পরিবর্তন করার কোনো ঘটনা কি মুসলিম মনীষীদের জীবনীতে নেই?! হযরত সালমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনা তো হাদীসের মশহূর প্রায় সকল কিতাবেই আছে।[১৩৮] ইলম অর্জনের তীব্র পিপাসা নিউটন থেকে শিখতে হবে?! কত শত ঘটনা প্রয়োজন– এক *ছাফাহাত* খুললেই পেয়ে যাবেন! নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রতা ছেড়ে মনে করা হচ্ছে– আমরা উদারতা প্রকাশ করছি! পরমুগ্ধতা তো সৃষ্টিই হয়েছে আমাদের কারণে। আমরা আমাদের মনীষীদের শ্রেষ্ঠত্ব তো তুলে

---

১৩৭ নামের অর্থটা নিয়ে একটু ভাবুন।

১৩৮ *আল-মুসনাদুস সহীহ*, ইমাম মুসলিম (১/১৩০) হাদীস নং ২৬২ (ইস্তেতাবার অধ্যায়), *আল-মুজতাবা*, ইমাম নাসাঈ (পৃ ১৩৩) হাদীস নং ৪১ (তিনটি পাথরের কমে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করার অধ্যায়), *আস-সুনান*, ইমাম আবূ দাউদ (১/৩) হাদীস নং ৭ (ইস্তেঞ্জার সময় কিবলামুখী হওয়া মাকরূহ হওয়ার অধ্যায়), *আল-জামি*, ইমাম তিরমিযী (১/১০) হাদীস নং ১৬ (পাথর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করার অধ্যায়), *আস-সহীহ*, ইমাম ইবেন খুযাইমা (১/৮০) হাদীস নং ৭৪ (পাথর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে আদেশ করার অধ্যায়), *আল-মুসনাদ*, ইমাম আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী (১/২৫১-২৫২) হাদীস নং ৬৮৯

ধরিই নি। অধিকন্তু প্রয়োজনের সময় অন্যদেরকেই আদর্শরূপে পেশ করেছি।[১৩৯]

চতুর্থ মারহালা :

- সর্বশেষ মারহালায় আমাদের কাজ হবে মুকারানা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'মুকারানা করে পড়ুন' শিরোনামে সামনে আসছে।[১৪০]

১৩৯ আমাদের মূল সমস্যা আমাদের চেতনায়। অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ হল– আজ কওমী মহলে এমন অনেক মানুষ ঢুকে পড়েছে, চেতনাগত দিক থেকে কাসেমী চৈতন্যের সঙ্গে যাদের মোটেও পরিচয় বা সাদৃশ্য কোনোটাই নেই। বড়দের কর্ম ও বাণীর আলোকে ***আমাদের চেতনা*** শিরোনামে কিছু লেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো মুতকিন ছাদেক বান্দাকে এ বিরাট শুন্যতা পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১৪০ এই লেখাটি মূলত আরবীতে লেখা হয়েছিল। যেহেতু বেশ কিছু বিষয়ে বইয়ের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তাই লেখাটি এখানে বাংলাভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হয়েছে। কিছু বৃদ্ধিও হয়েছে। লেখার তারিখ : ২৯ই সফর ১৪৪২ হিজরী।

একই কিতাব বারবার অধ্যয়ন করুন

আমাদের বড়দের অনুসৃত অনেক পদ্ধতি আমরা আজ ছেড়ে দিয়েছি। অথচ জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে মানযিলে মাকছূদে পৌঁছতে হলে অভিজ্ঞজনের পরামর্শ একটি নেহায়েত জরুরী বিষয়। জ্ঞানী মাত্রই এ কথায় দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। হ্যাঁ, আমরা যা কিছু করবো বুঝে বুঝেই করবো।

বড়দের অনুসৃত পন্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো, এক কিতাব বারবার অধ্যয়ন করা। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। আমাদের বড়রা বলেছেন, 'দুই কিতাব একবার পড়ার চেয়ে এক কিতাব দু'বার পড়া ভালো।'[১৪১]

বড়দের অনুসৃত রীতিকে তরক করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বয়স অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় শিক্ষা দেয়। মূলত সেসব শিক্ষাই বড়দের কথায় ও কাজে আমরা দেখতে পাই। বুঝে না আসলেও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞজনদের পরামর্শ অনুযায়ী যিন্দেগী পরিচালনা করা উচিত।

আমাদের যারা মহান পূর্বসূরি তাঁদের মেধা ও স্মরণশক্তির কথা তো ইসলামের শত্রুরাও অকপটে স্বীকার করে। ৫০/৬০টি হাদীস দীর্ঘ সনদসহ একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যেত। কোনোই বেগ পেতে হতো না। তাদের যমানায় একেকজন ফকীহ ও মুহাদ্দিসের লক্ষাধিক হাদীস মুখস্থ থাকতো একেবারেই অনায়াসে। একটি হাদীস ৫/১০/২০/৫০/১০০ সনদে মুখস্থ থাকতো, কোনো সমস্যা হতো না। তারপরও তারা একেক কিতাব ১০/২০/৫০/১০০ বার পড়েছেন। এমনকি ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি

---

১৪১ ***তা'লীমুল মুতাআ'ল্লিম***। এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি এখন কাছে নেই। তাই হাওয়ালা বের করে দিতে পারলাম না।
হযরত যারনূজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভাষায়–

قراءةُ كتابٍ مرتينِ خيرٌ من قراءة كتابينِ مرةً

আমাদের নাকেছ রায়ে মনে হয়– এই কিতাবের কোনো বদল এখনো লেখা হয় নি। অন্তত সচরাচর আমাদের হাতের কাছে নেই। যদিও হযরত শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম-এর ***মা'আলিমু ইরশাদিয়্যা*** তালিবে ইলমদের আদাব ও আখলাক সংশোধনে ফিলহালের রচনাগুলোর মধ্যে এক অদ্বিতীয় গ্রন্থের মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্রন্থ দু'টি আমাদের পড়া দরকার। বারবার পড়া দরকার। হজম করে করে এবং আমল করে করে পড়া দরকার।

আলাইহি তো *আল-ওয়াসীত* নামের ফিকহের একটি কিতাব **চ-া-র-শ-ত-ব-া-র** অধ্যয়ন করেছেন![১৪২]

হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وقد قال فيما أحفظ — والله أعلم —: إنِّيْ طالعتُ «مختصر الطحاوي» نحو عشرين مرةً، ومع ذلك لم يشفِ صدري في مواضع كثيرةٍ.

'ইমামুল আছর আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন (যেমনটা আমার মনে আছে), ইমাম ত্বহাবীর *মুখতাসার* গ্রন্থটি আমি প্রায় বিশবার অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু তারপরও বেশ কিছু জায়গায় আমার ইশকাল রয়ে গেছে।'[১৪৩]

উসূলুল ফিকহের বিখ্যাত মুহাক্কিক ইমাম আল্লামা আবদুল আযীয বুখারী (মৃত ৭৩০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وقال المزني رحمه الله تعالى: قرأتُ كتاب «الرسالة» على الشافعي رحمه الله تعالى ثمانين مرةً، فما من مرةٍ إلا وكان يقف على خطأٍ، فقال الشافعيُّ: هيه، أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحًا غير كتابه.

'ইমাম মুযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আমি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে *আর-রিসালা* গ্রন্থটি আশিবার পড়েছি। প্রতিবারই তিনি কোনো না কোনো ভুল পেতেন। এরপর তিনি বললেন, রাখ, আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিতাব পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়াটা আল্লাহ চান না।'[১৪৪]

নিকট অতীত ও বর্তমানের উলামায়ে কেরামের জীবনী থেকে নিম্নে কিছু নমুনা দেখুন :

---

১৪২ *কীমাতুয যামান ইন্দাল উলামা* পৃ. ১৩০

১৪৩ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিত *তারাজিমু সিত্তাহ* পৃ. ৩৭ (*নাফহাতুল 'আম্বার*-এর হাওলায়)।

১৪৪ *কাশফুল আসরার* (ভূমিকার শেষ দিকে) ১/১৯

১. মুফতীয়ে আ'যম ফায়যুল্লাহ ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি *হিদায়া* ১৭বার পড়েছেন। এটাও তাঁর গণনার মধ্যে। এর পরে আরো বারবার তিনি *হিদায়া* মুতালা'আ করেছেন।(১৪৫)

২. শামসুল উলামা মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি *হিদায়ার* মতো সুকঠিন কিতাব পড়েছেন ৬৭বার!(১৪৬)

৩. হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র একটি হাওলা যাচাই করার জন্য পুরো **ফাতহুল বারী** অধ্যয়ন করেছেন।(১৪৭)

৪. হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি *কালীলা ওয়া-দিমনা* গ্রন্থটি ১০০বার অধ্যয়ন করেছেন!(১৪৮)

৫. হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম কিছু তথ্যের জন্য *ফাতহুল বারী*-এর মত বিরাট গ্রন্থ কয়েকবার অধ্যয়ন করেছেন!(১৪৯)

৬. হযরত মাওলানা যাইনুল আবিদীন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বারবার এবং অনেকবার *মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর* গ্রন্থটি পড়েছেন। বিভিন্ন বাক্য সম্পর্কে সুন্দর কিছু অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। আরো পড়তে পারেন নি বলে আফসোস করেছেন। বইটির কথা মনে পড়লে এখনো অশ্রুসজল হন বলে উল্লেখ করেছেন।(১৫০)

বালাগাত শাস্ত্রের মুহাক্কিক আলিম ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ মূসা (হাফিযাহুল্লাহু) বলেন,

حتى إنّ أحد نُحاة الأندلس كان يختم قراءةَ كتابِ سيبويه كلَّ خمسة عشر يومًا، وحتى إنّ المزني صاحب الشافعي قرأَ رسالته خمس مئة مرةٍ، وأصاب في المرة الأخيرة ما لم يُصبه في غيرها!

---

১৪৫ *আকাবিরে দেওবন্দের ছাত্রজীবন* ১/২২৪

১৪৬ ***সমাজ সংস্কারক মুজাহিদে আ'যম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী***, মাওলানা আবদুর রাজ্জাক। গ্রন্থটি বর্তমানে লেখকের সংগ্রহে না থাকায় হাওয়ালা বের করা গেল না।

১৪৭ এটা আমাদের উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা জিকরুল্লাহ খান ছাহেব দা. বা. থেকে শ্রুত। এখনো কোনো কিতাবে পড়ার সুযোগ হয় নি।

১৪৮ মাওলানা যাইনুল আবিদীন লিখিত ***প্রিয় লেখক প্রিয় বই*** পৃ. ২০৮

১৪৯ এটাও আমাদের খান ছাহেব হুযূর থেকে শ্রুত।

১৫০ ***প্রিয় লেখক প্রিয় বই*** পৃ. ২০৮

وهذا معناه: أن تكرار النظر في الكتاب يُنبتُ في النفس معرفةً جديدةً؛ لأن طول التدبر في الكتاب يكشفُ بين سطوره – وتحتها – إشاراتٍ، لم يكن ليكتشفها القارئ إلا بطول المراجعة وطول التدبر، وقد يُثير طول التدبر في الكتاب خواطر عند القارئ ليست من الكتاب، وإنما ما كانت لتكون في نفس القارئ إلا بهذا الكتاب.

وهذا يعني: أن طول ملازمة أهل العلم للكتاب؛ إما أن يستخرجوا هم منه أفكارًا، أو يستخرج هو منهم أفكارًا،/ وكل هذا مما تزيد به المعرفة وتربو./

إنك بطول الملازمة للكتاب قد تنفذ أنت إلى معنًى مخبوءٍ فيه، وربما قرأه من هو أنفذ نظرًا منك، ولم يقع عليه، وقد ينفذ الكتابُ إلى معنى مخبوءٍ في نفسك أنت أيها القارئ؛ فيُثيرُه، ويفتح لك به بابًا من العلم.

'স্পেনের একজন নাহুবিদ (ইবনুল আসলামী আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ) তো প্রতি পনেরো দিনে একবার সিবাওয়াইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *আল-কিতাব* পড়ে শেষ করতেন। ইমাম শাফেয়ীর শাগরেদ ইমাম মুযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তাঁর উস্তাদের গ্রন্থ *আর-রিসালা* পাঁচশ'বার পড়েছেন। শেষবার এমন ইলম পেয়েছেন, যা পূর্বে এতবার পড়ার পরও পান নি।

এর অর্থ হল– একটি কিতাব বারবার পড়া হলে পাঠকের হৃদয়ে নতুন নতুন জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। দীর্ঘ সময় চিন্তার মাধ্যমে পাঠক কিতাবের লাইনে, এমনকি লাইনের নিচ থেকেও এমন কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইশারা বের করে আনতে পারে যা দীর্ঘ চিন্তা ও বারংবার অধ্যয়ন ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কখনো তো এমনও হয়– দীর্ঘ চিন্তার কারণে পাঠকের হৃদয়ে এমন কিছু জ্ঞান ও চিন্তা উদ্ভাসিত হয়, যা মূলত কিতাবে নেই। তবে এ কিতাব ছাড়া সেগুলো পাঠকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি– উলামায়ে কেরাম একটি কিতাব দীর্ঘ সময় পড়ে হয়তো তারা কিতাব থেকে নতুন চিন্তা বের করে আনেন, কিংবা কিতাব তাদের হৃদয় থেকে নতুন চিন্তার ঝর্ণা উৎসারিত করে। উভয় পদ্ধতিতেই জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং উৎকর্ষ লাভ করে।

একটি কিতাব তুমি দীর্ঘ সময় পাঠের মাধ্যমে এমন কিছু সূক্ষ্ম ও গোপন রহস্য জানতে পারবে, হয়ত তোমার পূর্বে তোমার চেয়ে মেধাবী কেউ এ কিতাব পড়েছে। কিন্তু তিনি এসব গোপন রহস্যগুলো উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। আবার কখনো সুদীর্ঘ পাঠ ও ধারাবাহিক সংস্রবের কারণে কিতাব তোমার অন্তরে এমন এমন সূক্ষ্ম অর্থ ঢেলে দিবে, যা দিয়ে তুমি ইলমের নতুন একটি অধ্যায় আবিষ্কার করতে পারবে।'[১৫১]

তাহলে বলুন আমাদের কী করা দরকার? ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুযানী, ইমাম নববীসহ অন্যান্য ইমাম এবং যুগের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম একই গ্রন্থ পড়ছেন শত শত বার। আর আমরা হায়, একটি গ্রন্থ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেও কত অলসতা!

আপনি রাগেব আসফাহানী (মৃত ৫০২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন*** কিতাবটি শরহে বেকায়ার বছর পড়ে ফেললেন। শিক্ষকতার সময় এ কিতাব পড়ে আপনার কোনো ফায়েদা নেই– এমনটা ভাববেন না। একজন ইমাম যে যোগ্যতা ও গভীরতা নিয়ে কিতাব রচনা করেন একজন সাধারণ পাঠকের সে জ্ঞান ও গবেষণা বুঝে অধ্যয়ন করার সাধ্য কোথায়? তবে দিন-দিন জ্ঞান অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। চিন্তা সমৃদ্ধ হয়। মেধা বিকশিত হয়। বুঝ প্রখর হয়। রুচি স্বচ্ছ হয়। তাই যখন একই কিতাব কিছু দিন পর পড়া হবে তখন এ কিতাব থেকে আরো বেশি ফায়েদা নেওয়া যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ খেয়াল করুন, হযরত ইমাম ইবনে হিশাম নাহবী (মৃত ৭৬১ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***শারহু কতরিন্নাদা*** কিতাবটি আপনি কাফিয়া বা শারহে জামীর সঙ্গে যখন পড়বেন, তখন তো শুধু কিতাবটি হল করে এবং আয়ত্ব করে সামনে অগ্রসর হবেন। কিন্তু নাহু বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান হলে, শিক্ষকতার মাধ্যমে কিছু অভিজ্ঞতা হলে তখন দেখা যাবে, আপনি বলছেন– হায়রে, ***শারহু কতরিন্নাদা*** বোঝার যোগ্যতা ছাত্রদের হবে কী করে? এই তাকাযায় আপনার কাছে মনে হবে, কিছু ভাল তালিবে ইলমদের কিতাবটি পড়তে না দিয়ে, সঙ্গে কিছু পড়িয়ে দেয়াও উচিত। তা না হলে ছাত্ররা সহজে ইমামের গভীর জ্ঞান থেকে যথাযথ ফায়েদা নিতে পারবে না।

নিচের জামাত থেকে নিয়ে উপর জামাত পর্যন্ত আমরা যেসব কিতাব পড়ি সাধারণত সব কিতাবের লেখক ইমাম ছিলেন। এসব আইম্মায়ে কেরামের কিতাব একজন

---

১৫১ **মিন মাদাখিলিত তাজদীদ** পৃ. ৭৭-৭৯
এই পুরো কিতাবটি একজন তালিবে ইলমের জন্য পাঠ করা এবং বারবার পাঠ করা খুবই জরুরী। সত্যিই কিতাবটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। *এভাবে পড়ুন*-এর পাঠকদের কাছে খুবই তাকীদের সঙ্গে আবেদন করবো, তারা যেন এ কিতাবটি পড়েন এবং বারবার পড়েন।

সাধারণ ও নগণ্য তালিবে ইলম তার অপরিপক্ক জ্ঞান ও বুঝ দিয়ে কিভাবে একবারেই আয়ত্ব করে ফেলবে? দরসী অধ্যয়নে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য এ কথা নয়।

আহলে ফন তো মনে করেন, গুরুত্বপূর্ণ কিতাব বারবার অধ্যয়ন করা ছাড়া তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জন করা সম্ভব নয়। বারবার বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা-ফিকির করে পড়তে হবে। আমাদের সালাফের অধিকাংশ ইমাম একাধিক ফনে মাহের ছিলেন। তাই তাঁদের একজনের এক কিতাবেই বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে। তাফসীরের কিতাব। কিন্তু কত ফিক্বহী আলোচনা! আরবীসাহিত্যের কত জটিল আলোচনা! প্রত্যেক লেখকের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী তার কিতাবে ইলম ও ফাহ্মের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ জন্য কিতাব বুঝে ও আয়ত্ব করে পড়া দরকার।

প্রিয় তালিবে ইলম ভাই আমার, আসুন, আমরা পাক্কা নিয়ত করি, আমরা ফনের ইমামগণের কিছু কিতাব অবশ্যই বারবার পড়বো ইনশা-আল্লাহ। নিম্নে কিছু বিষয়ভিত্তিক ছোট্ট একটি তালিকা পেশ করা হয়েছে :

তাফসীর ও ফুনূনুল কুরআনের জন্য :

- *জামিউ'ল বায়ান*, ইমাম ইবনে জারীর তবারী।
- *মা'আনিল কুরআন*, আবূ জা'ফর নাহ্হাস।
- *আল-কাশ্শাফ*, যামাখশারী।
- *আল-মুহার্রারুল ওয়াজীয*, ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসী।
- *মাফাতীহুল গায়ব*, ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী।
- *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, হাফেয ইবনে কাসীর।
- *রূহুল মা'আনী*, আল্লামা মাহমূদ আলূসী।
- *ফাওয়ায়েদে উসমানী*, শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমাদ উসমানী।
- *আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর মিনাত-তাফসীর*, আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির ইবনে 'আশূর।

- *আহকামুল কুরআন*, আবূ বকর জাস্সাস।
- *আহকামুল কুরআন*, ইবনুল 'আরাবী।

- *মুশকিলাতুল কুরআন*, ইমামুল আছর কাশ্মীরী।

- *গরীবুল কুরআন*, ইমাম ইয়াযীদী।
- *মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন*, রাগেব আসফাহানী।
- *উ'মদাতুল হুফ্ফায*, সামীন হালাবী।

- *মুকাদ্দিমাতুন ফী উসূলিত তাফসীর*, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।
- *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, যারকাশী।
- *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, হাফেয সুয়ূতী।
- *ইয়াতীমাতুল বায়ান*, হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী।

হাদীস ও উলূমুল হাদীসের জন্য :

- *আল-জামি'উস সহীহ*, ইমাম বুখারী।
- *আল-মুসনাদুস সহীহ*, ইমাম মুসলিম।
- *সহীহ ইবনে খুযাইমা*।
- *আল-মুজতাবা*, ইমাম নাসাঈ।
- *আল-জামে'*, ইমাম তিরমিযী।

- *আল-'ইলাল*, আলী ইবনুল মাদীনী।
- *আল-'ইলাল*, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল।
- *কিতাবুত তাময়ীয*, ইমাম মুসলিম।
- *আল-'ইলালুস সগীর*, তিরমিযী।
- *আল-ই'লালুল কাবীর*, তিরমিযী।
- *আল-'ইলাল*, ইবনু আবী হাতেম।
- *আল-'ইলাল*, দারাকুতনী।

- *আত-তারীখুল কাবীর*, ইমাম বুখারী।
- *আত-তারীখুল কাবীর*, ইবনু আবী খায়ছামা।
- *আল-কামেল*, ইবনু 'আদী।
- *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, হাফেয যাহাবী।
- *মীযানুল ই'তিদাল*, হাফেয যাহাবী।
- *তাহযীবুত তাহযীব*, হাফেয ইবনে হাজার।

- *মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস*, হাকেম নিশাপূরী।
- *আল-কিফায়াহ*, খতীব বাগদাদী।
- *আল-জামি'*, খতীব বাগদাদী।
- *মুকাদ্দিমাতুত তা'দীল ওয়াত-তাজরীহ*, হাফেয আবুল ওয়ালীদ বাজী।
- *শারহু 'ইলালিত তিরমিযী*, ইবনে রজব হাম্বলী।
- *আন-নুকাত*, হাফেয ইবনে হাজার।
- *হাদউস সারী*, হাফেয ইবনে হাজার।
- *ফাতহুল মুগীস*, হাফেয সাখাবী।

- *আর-রফউ' ওয়াত-তাকমীল*, মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী।
- *ইজমা'উল মুহাদ্দিসীন*, ড. হাতেম বিন আরিফ আওনী।
- *আল-হাদীসুল মা'লূল; কওয়ায়েদ ওয়া-যাওয়াবেত*, ড. হামযা আবদুল্লাহ মালীবারী।
- *মুহাযারাতে 'উলূমুল হাদীস*, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক।

- *নাছবুর রায়াহ*, হাফেয যাইলাঈ'।
- *তানকীহুত তাহকীক*, হাফেয ইবনে আবদুল হাদী হাম্বলী।
- *তাগলীকুত তা'লীক*, হাফেয ইবনে হাজার।

- *আল-ইসতিযকার*, ইবনে আবদিল বার।
- *আল-মুয়াস্‌সার শারহু মাছাবীহুস সুন্নাহ*, তূরবিশতী।
- *ফাতহুল বারী*, হাফেয ইবনে রজব।
- *জামি'উল উলূমি ওয়াল-হিকাম*, ইবনে রজব।
- *মাবারিকুল আযহার শারহু মাশারিকিল আনওয়ার*, ইবনু মালাক।
- *ফাতহুল বারী*, হাফেয ইবনে হাজার।
- *ফায়যুল বারী*, ইমামুল আছর কাশমীরী।
- *মাজমুয়ায়ে রাসায়িল*, কাশমীরী।
- *মা'আরিফুস সুনান*, ইউসুফ বানূরী।
- *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী।

- *আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়্যা*, ইমাম তিরমিযী।
- *যাদুল মা'আদ*, ইবনুল কায়্যিম।

- *গরীবুল হাদীস*, ইবনে কুতায়বা।
- *আল-ফায়েক ফী গরীবিল হাদীস*, যামাখশারী।
- *আন-নিহায়া*, ইবনুল আসীর জাযারী।

ফিকহ ও উলূমুল ফিকহের জন্য :

- *আল-হুজ্জাহ 'আলা আহলিল মাদীনাহ*, ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান।
- *শারহু মা'আনিল আছার*, ইমাম তহাবী।
- *শারহু মুশকিলিল আছার*, ইমাম তহবী।
- *আল-আওসাত*, ইবনুল মুনযির।

- *আর-রিসালা*, ইমাম শাফেয়ী।
- *আল-ফুসূল ফিল উসূল*, জাস্‌সাস।
- *তাকবীমুল উসূলিল ফিক্‌হ*, কাযী দাবূসী।
- *আল-মুহার্‌রার*, সারাখসী।
- *কাশফুল আসরার*, আবদুল আযীয বুখারী।
- *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন*, হাফেয ইবনুল কায়্যিম।
- *শারহুল মানার*, ইবনু মালাক।
- *আত-তাহরীর*, ইবনুল হুমাম।
- *ফাওয়াতিহুর রহামূত*, বাহরুল উলূম আবদুল আলী লাখনবী।

- *আল-উম্ম*, ইমাম শাফেয়ী।
- *শারহু মুখতাসারিত তহাবী*, জাস্‌সাস।
- *আল-মাবসূত*, সারাখসী।
- *আল-হিদায়া*, ইমাম মারগীনানী।
- *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, ইবনে রুশদ আল-হাফীদ।
- *বাদায়িউ'স সানায়ে'*, ইমাম কাসানী।
- *আল-মুগনী*, ইবনে কুদামা হাম্বলী।
- *তাবয়ীনুল হাকায়েক*, ফাখরুদ্দীন যাইলায়ী'।
- *ফাতহুল ক্বদীর*, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম।
- *আল-বাহরুর রায়েক*, ইবনে নুজাইম।
- *রদ্দুল মুহতার*, ইবনে 'আবিদীন শামী।
- *ফিকহুল বুয়ূ'*, হযরত শাইখুল ইসলাম তাকী।

- *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ইমাম গাযালী।
- *আল-মুয়াফাকাত*, শাতেবী।
- *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী।
- *মাকাছিদুশ শারীয়াহ*, তাহির ইবনে 'আশূর।

- *আল-ইহকাম ফী তাময়ীযিল ফাতাওয়া আ'নিল আহকাম*, আবুল আব্বাস কারাফী।
- *শারহু উকূদি রসমিল মুফতী*, ইবনে আ'বিদীন শামী।
- *উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু*, হযরত শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী।

- *শারহুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা*, আহমাদ মুহাম্মাদ যারকা।

আরবীভাষা ও তার উলূমের জন্য :

- *মাকায়ীছুল লুগাহ*, ইবনে ফারেস।
- *তাহযীবুল লুগাহ*, আযহারী।
- *আল-মুহকাম*, ইবনে সাইয়েদা আন্দালুসী।
- *আল-মুগরিব*, মুতারি্রযী।
- *লিসানুল আ'রব*, ইবনে মানযূর।

- *আসরারুল বালাগাহ*, আবদুল কাহের জুরজানী।
- *দালায়িলুল ই'জায*, জুরজানী।
- *আসাসুল বালাগাহ*, যামাখশারী।

- *আল-কিতাব*, সীবাওয়াইহ।
- *আল-কামিল*, মুবাররিদ।
- *আল-মুফাস্সাল*, যামাখশারী।
- *শারহু কাতরিন নাদা*, ইবনে হিশাম।
- *মুগনীল লাবীব*, ইবনে হিশাম।

- *দীওয়ানুল হামাসাহ*, আবূ তাম্মাম।
- *শারহুল হামাসা*, মারযূকী।
- *দীওয়ানুল মুতানাব্বী*, আবুত তাইয়িব।
- *শারহুল মুকাদ্দিমাতিল আদাবিয়্যা*, তাহের ইবনে 'আশূর।

সব যুগেই এক জামাত মুহাক্কিক আলিম থাকেন, যাদের কোনো কোনো কিতাব দশ-বিশবার পড়ার পরও যেন হক আদায় হয় না। তাই প্রাজ্ঞ উস্তাদদের সংশ্রবে থেকে এসব কিতাব চিনুন এবং অধ্যয়ন করতে থাকুন। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

মতনের সঙ্গে শরাহ অধ্যয়ন করুন

কিতাবের শরাহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। কিতাবের অনেক গোপন তথ্য ও তত্ত্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এসব শরাহে। তাফাক্কুহ অর্জনের জন্য এসব শরাহের কোনো বিকল্প নেই।

শরাহগুলো বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। তাই সব শরাহ সকল তালিবে ইলম ভাইয়ের জন্য মুনাসিব নয়– আশা করি, বিষয়টি সবার কাছেই বোধগম্য। শরাহের কিছু ধরণ দেখুন :

- কিছু শরাহ থাকে মতন হল করার জন্য। যদিও অন্যান্য সামান্য কিছু ফায়েদাও পাওয়া যায়। কিন্তু লেখকের মূল হরকত হল, মতন হল করা। যেমন *হিদায়ার* শুরূহের মধ্যে ***আল-'ইনায়াহ*** ও ***আল-কিফায়াহ***।
- কিছু শরাহ থাকে মতন হল করার সঙ্গে সঙ্গে ফনের গুরুত্বপূর্ণ ফাওয়ায়েদ-সম্বলিত। এসব শরাহে কঠিন মতন যেমন হল হয়, আবার প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অনেক ফাওয়ায়েদও পাওয়া যায়। ***তাবয়ীনুল হাক্বায়েক্ব*** ও ***আল-বিনায়াহ*** এ ধরণের শরাহ।
- আর কিছু শরাহ থাকে মতনের মাসায়েলের দলিল পেশ করার জন্য। ***শারহু মুখতাসারিত তহাবী*** ও ***আল-ইখতিয়ার*** এ ধরণের শরাহ। এ দু'টি কিতাবের মান একইরকম– এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। কোথায় ইমামের শরাহ, আর কোথায় একজন আলিমের শরাহ?!
- আর অল্প কিছু শরাহ থাকে, যেসবে লেখকদের উদ্দেশ্য, ফনের মুশকিলাত হল করা। লেখক যা বলেছেন তার তাকলীদ না করে অন্যান্য কিতাব দেখে বিষয়টা যাচাই করা। এ ধরণের শরাহ কম পাওয়া যায়। ***ফাতহুল ক্বদীর*** ও ***আল-বাহরুর রায়েক*** এ ধরণের শরাহের অন্তর্ভুক্ত।
- অতি অল্প কিছু শরাহ আছে, যাতে শারেহ মামযূজভাবে খুবই কম শব্দে প্রচুর তাহকীকী কথা নিয়ে আসেন। ফনের খোলাসা অল্প শব্দে পেশ করেন। ***হিদায়া*** ও ইবনুল মালাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত ***শারহুল মানার*** এ ধরণের শরাহ।

সকল তালিবে ইলম ভাইদের শরাহ পড়ার উদ্দেশ্যও এক নয়। কোনো কোনো ভাই আছেন, *হেদায়া* পড়ে শেষ করতেই তার কষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য ***ফাতহুল ক্বদীর*** নয়। এমনকি *'ইনায়া* ও *বিনায়া*ও নয়। তিনি শুধু মূল কিতাব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন।

আবার কোনো ভাই মূল কিতাব পড়ে সময় পান। কিন্তু মেধা ও যোগ্যতায় তিনি মধ্যম স্তরের উপরে নন। তাই তার জন্যও ***ফাতহুল ক্বদীর***-এর মত কিতাব উপযোগী নয়। তিনি পড়তে পারেন *'ইনায়া* ও *বিনায়া* বা অন্য কোনো শরাহ।

আমাদের যেসব ভাইদেরকে আল্লাহ ভালো মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন, এই নেয়ামতের দাবি হল– তারা ইমামগণের এসব ইলমী খেদমত থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে। তাঁরা তো আমাদের জন্যই এসব গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আমরা অনেক সময় ধারণা করি, ***ফাতহুল ক্বদীর*** তো কঠিন কিতাব। এটা আমাদের জন্য নয়, মুফতী সাহেবদের জন্য। আমার কিতাব পড়ার উদ্দেশ্য যদি হয়, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জন করা, তাহলে ***ফাতহুল ক্বদীর*** তো আমার জন্যও। শরাহ হিসেবেও তো এর দাবি হল, *হিদায়া*র পাঠকরাই এর প্রথম মুখাতাব।

ভাই, সহজ কিতাব তো সবাই পড়ে এবং পড়তে পারে। আপনি-আমিও যদি সহজ কিতাবই পড়তে চাই, তাহলে আমরা যে ভালো আলিম হতে চাই, আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী হবে? অন্যরা যে কিতাব পড়তে সাহস করে না, আমরা যদি সাহস করে সে কিতাব পড়তে পারি, তাহলেই তো আমরা বিশেষ কিছু করতে পারবো বলে আশা করা যায়।

আমরা অনেকেই মনে করি– আমি তো এখন ***কানযুদ্দাকায়েক***-এর সঙ্গে ***আন্নাহরুল ফায়েক***-এর মত ছোট শরাহও পড়ে শেষ করতে পারবো না। তাহলে অন্যান্য বিস্তারিত শরাহ পড়ার সময় পাবো কোথায়?

বড়দের জীবনীর দিকে যাবো না। আশা করি, আমাদের অধিকাংশ তালিবে ইলম ভাইয়েরা সেসবের অনেক ঘটনাই জানেন। শুধু আমার ভাইদের কাছে আরয করবো– ভাই, আপনি যদি ***তাফসীরে জালালাইন***-এর সঙ্গে ***হাশিয়াতুস সাবী*** দু'শত পৃষ্ঠাও পড়েন, ক্ষতি কোথায়? দশ পৃষ্ঠাও যদি হয় সারা বছরের মোট পড়া, ক্ষতির কী আছে বলুন? আপনি পুরো ***ফাতহুল ক্বদীর*** না পড়তে পারলেও সারা বছর মুহাব্বত ও আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে থাকলে এক খণ্ডের মত তো পড়া হয়ে যাবে।

শুরু-শেষ পড়ার সুযোগ ও হিম্মত যদি নাও হয়, পড়া জারি রাখুন। বন্ধ করবেন না। পারলে কোনো উস্তাদ থেকে পরামর্শ নিয়ে কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো নির্দিষ্ট

করে পড়তে থাকুন। তাহলে অল্প পড়াতেও অনেক ফায়দা হবে ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ সহজ করুন। আমীন।

শরাহের মত তাখরীজও পড়তে হবে। *হিদায়া* কিতাবের একজন তালিবে ইলমের জন্য একান্ত জরুরী– *দিরায়া* ও *নাসবুর রায়াহ* গ্রন্থ বুঝতে পারা এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারা। *উসূলুশ শাশী*র উপর যদিও (আমাদের জানামতে) ভিন্ন কোনো তাখরীজ লেখা হয় নি, কিন্তু যদি *উসূলুল বাযদাবী*র উপর লেখা হযরত কাসেম ইবনে কুতলূবুগা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাখরীজ দেখা হয়, অনেক ফায়দা হবে। কারণ, উভয়টি একই ফনের কিতাব। তাই একই হাদীস উভয় কিতাবে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তাছাড়া *উসূলুশ শাশী*র আহাম মারাজি'য়ের মধ্যে *উসূলুল বাযদাবী*ও অন্তর্ভুক্ত। তবে তাখরীজ পড়ার ক্ষেত্রে দু'একটি কথা মনে রাখতে হবে–

- আমাদের লেখক হানাফী ফিকহকে সাব্যস্ত করতে যেসব হাদীস পেশ করেছেন, এগুলো ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পেশকৃত হাদীস– এটা নিশ্চিত নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই ইমাম মূলত ভিন্ন দলিল দিয়েছেন। কিন্তু লেখক দলিল হিসেবে যেসব হাদীস পেয়েছেন উল্লেখ করেছেন। তাই কেউ যদি মনে করেন, ছাহিবুল *হিদায়া* তাঁর গ্রন্থে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটাই ইমাম ছাহেবের দলিল, ভুল হবে। এরই ভিত্তিতে কেউ বলে দিতে পারেন, ইমাম আবূ হানীফা সহীহ হাদীসের বিপরীতে যয়ীফ হাদীস দিয়ে দলিল দিয়েছেন!

  হ্যাঁ, যে কোনো দলিলের ক্ষেত্রেই লেখকের ব্যাপারে ভিন্ন ধারণা ঠিক হবে না। কারণ, আপনি যদি পিছনের আইম্মায়ে কেরামের কিতাব মুরাজা'আত করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, লেখক মূলত ঐসব কিতাব থেকে নকল করেছেন। ঐসব গ্রন্থাবলির মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *কিতাবুল আছল* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- কোনো হাদীস দুর্বল প্রমাণিত হলেও মাযহাব দুর্বল বিবেচিত হবে না। কারণ, মাযহাবের ভিন্ন দলিলও রয়েছে।

- হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *দিরায়া* কিতাবের তালখীস সুন্দর হয় নি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা ছুটে গেছে। তাই *দিরায়া* পড়তে হলে এর মূল গ্রন্থ *নাসবুর রায়াহ*-কে অবশ্যই সামনে রাখবো। কখনো তো এমনও হয়, হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফী মাযহাবের একটি হাদীসের ব্যাপারে *দিরায়া* গ্রন্থে ভিন্ন রকম কিছু বলে গেছেন। কিন্তু অন্য কিতাবে গিয়ে তিনি একই হাদীসকে মযবূত দলিল দিয়ে বিস্তারিতভাবে

হাসান বলে প্রমাণিত করছেন। অথচ চাইলে এ কথাটা সংক্ষেপে *দিরায়াতেও* বলে দিতে পারতেন। দলিল থাকলে অবশ্যই সুধারণা করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় মানুষের কর্মপদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলে সুধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।[১৫২]

***

যদি কোনো কিতাবের ভালো শরাহ পাওয়া যায় না, কিংবা আপনার সংগ্রহে না থাকে, তাহলে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কিতাব দেখুন। উদাহরণস্বরূপ– আপনার কাছে **হিদায়া** পড়ার সময় **ফাতহুল কুদীর** নেই তো আপনি **তাবয়ীনুল হাকায়েক** অধ্যয়ন করুন। **আল-বাহরুর রায়েক** দেখুন।

তাফসীরে জালালাইন পড়ার সময় **তাফসীরে ইবনে কাসীর**, **বায়ানুল কুরআন**, **তাফসীরে উসমানী** ও অন্যান্য কিতাব দেখুন। কোথাও লেখকের মতের বিপরীত কিছু পেলে তাহকীক করুন।

***

প্রতিটি গ্রন্থেরই কিছু উৎসগ্রন্থ থাকে। তাই যদি সম্ভব হয় উৎসগ্রন্থও সংগ্রহ করে পড়ুন। **বিকায়া**-এর মতনের মূল উৎস **হিদায়া**। শারেহও **হিদায়া** থেকে যথেষ্ট ফায়েদা নিয়েছেন। তাই **শারহুল বিকায়া** পড়ার সময় *হিদায়া*-কে সামনে রাখুন। মাঝে মাঝে খুলে দেখুন।

হিদায়া পড়ার সময় ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর **আল-জামিউস সগীর** সংগ্রহ করুন। পারলে এর কিছু শরাহও সংগ্রহ করুন। যদিও এখন পর্যন্ত (আমাদের জানা অনুযায়ী) ইমাম ওমর বিন মাযাহ ও মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)-এর শরাহ ছাড়া অন্য কোনো শরাহ ছাপে নি। আফসোস,

---

১৫২ الأذنانِ من الرأس হাদীসটি এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত হাফেয ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটির ব্যাপারে *দিরায়াহতে* এমনভাবে আলোচনা করেছেন, যেন হাদীসটির দুর্বলতা প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে! কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর *আন-নুকাত* গ্রন্থে হাদীসটিকে সর্বনিম্ন হাসান বলছেন। বরং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) তো আশ্চর্যজনক কথা বলেছেন! তিনি বলেছেন,

الأذنان من الرأس کی تخریج دیکھنا چاہیں تو "نصب الراية"، "النکت" ابن حجر، "الجوهر النقي" میں دیکھ لیں۔ حاشیہ ابن الصلاح میں بلقینی نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ یہ مقام ان جگوں میں سے ہے جہاں حافظؒ کی تحقیق و تخریج شاید سب سے فائق ہے۔ "محاضرات علوم الحدیث" ص ۱۵۷

শত শত ইমাম এ বরকতপূর্ণ কিতাবের শরাহ লিখেছেন! হায়, কারো শরাহ এখনো ছাপলো না।[১৫৩]

উসূলুশ শাশী যখন পড়বো **উসূলুস সারাখসী** ও **উসূলুল বাযদাবী** অবশ্যই সামনে রাখবো। স্পষ্ট বুঝতে পারবো, লেখক কিভাবে পরিবর্তন করে এ দুই ইমামের কথার আলোকেই কিতাবটি রচনা করেছেন।

নূরুল আনওয়ার যখন পড়বো তখন সঙ্গে ***শারহু ইবনুল মালাক*** ও লেখকের ***কাশফুল আসরার*** গ্রন্থ অধ্যয়ন করবো। তখন আমি বুঝতে পারবো– কিভাবে মোল্লা জিয়ন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ দুই শরাহ থেকে ইস্তেফাদা করেছেন। কিতাব লেখার সময় এ দুই কিতাব না থাকলেও ধারণা করা যায়, তিনি হয়ত এসব গ্রন্থ পড়তে পড়তে মুখস্থই করে ফেলেছিলেন। তাই লেখার সময় সেসব কিতাবের হুবহু 'ইবারত তাঁর কিতাবের অধিকাংশ স্থানে উঠে এসেছে।

আরও বুঝতে পারবো– কোথায় কোথায় খেলাফ করাতে অসুন্দর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কিতাবের একেবারে প্রারম্ভেই কিতাবুল্লাহর উপর কেয়াসের যে উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, সেটাকে ***শারহুল মানার***-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন– ইমাম ইবনুল মালাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কতটা সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন!

---

১৫৩ আল্লাহ যদি আমাদের 'লাজনাতুল উলূমি ওয়াদ-দাওয়াহ'কে মাখতূত সংগ্রহ করার তাওফীক দান করেন, আমাদের খেদমতের বড় ইচ্ছা আছে। আল্লাহ, আপনি তাওফীক দান করুন, আমীন।

মুরাজা'আতের অভ্যাস করুন

আহলে ইলমের কাছে মুরাজা'আত মানে কেউ কোনো কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে কিছু বললে বা লিখলে তা নিজে খুলে দেখা; উল্লেখিত তথ্য সঠিক কিনা? কোথাও কোনো ভুল হয়ে গেল কিনা? এই মুরাজা'আত একজন তালিবে ইলমের জন্য ফরয পর্যায়ের আমল। মুরাজা'আত না করার অর্থই হলো নিজের মাঝে যাচাই-বাচাই ও তাহকীকের রুচির অনুপস্থিতি।

মানুষ হিসেবে প্রত্যেক কিতাবেই কিছু না কিছু ভুল থেকে যায়। লেখক যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেন, কিতাবকে নির্ভুল করার, উপস্থাপনাকে সুন্দর করার, তাহলে এটা তার জন্য দোষণীয় নয়। এ জন্য যে লেখকই কোনো কিতাবের হাওয়ালা দিবেন সে কিতাব খুলে দেখতে হবে। এতে সময় ব্যয় হবে বেশি, কিন্তু পড়া যতটুকু হবে অত্যন্ত মযবূত ও পাকাপোক্ত হবে। দুনিয়ার সকল জ্ঞানীর মতেই 'কাম্মিয়্যাতে'র তুলনায় 'কাইফিয়্যাতে'র গুরুত্ব বেশি। আমাদের শরীয়তের মূলনীতিও তা-ই।

অনেক সময় এমন হয়, লেখক যে কিতাবের হাওয়ালা দিয়েছেন তিনি সেখানের পুরো 'ইবারত তুলে ধরেন নি। বরং প্রয়োজন অনুপাতে কিছু অংশ এনেছেন। কখনো দেখা যায়– তিনি 'ইবারত সংক্ষিপ্ত করায় 'ইবারতের মূল মর্মই নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তিনি এটা ইচ্ছা করে করেন নি।[১৫৪] তাকে তাম্বীহ করা হলে, কিংবা তিনি নিজে মুরাজা'আত করলে অবশ্যই এ ভুল থেকে তিনি ফিরে আসবেন। অবশ্য বিদ'আতী লেখকরা ইচ্ছা করেও এসব করে থাকে।[১৫৫] সাধারণ মানুষের মত একজন তালিবে

---

১৫৪ উদাহরণস্বরূপ দেখুন আল্লামা তাহির জাযায়েরী (মৃত ১৩৩৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***তাউজীহুন নাযর ইলা উসূলিল আছার*** (১/১০) কিতাবের শুরুতে হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভূমিকা।

১৫৫ একটি নমুনা দেখুন– হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বিতরের 'তৃতীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতিটি আমাদের দেশে প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় রাকাত শেষে বসে তাশাহহুদ পড়া হয়। অথচ বিশ্বের খ্যাতনামা আলেম ভারতের আল্লামা সফীউর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন, এ-নিয়মের পক্ষে সরাসরি কোনো সহীহ হাদীস নেই, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতিতে বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন–

لا تُوْتِروا بثلاثٍ، ولا تشبَّهوا بصلاة المغربِ

ইলমও যদি সব লেখাকেই 'ওহী'র মত বিশ্বাস করে, তাহলে তালিবে ইলমের বিশেষ গুণটা কী? আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'আর আমি পাঠিয়েছি আপনার পূর্বে যে রাসূল এবং যে নবীকেই তিনি যখন ওহী পাঠ করতেন শয়তান তাঁর ওহী পাঠে প্রক্ষেপণ করতো (ওহীর বিষয়টি বিভ্রাটপূর্ণ করার জন্য)। অনন্তর মুছে দেন আল্লাহ যা প্রক্ষেপণ করেছে শয়তান তা, এরপর সুদৃঢ় করেন তাঁর আয়াতসমূহ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান।

(আল্লাহ তা করেন) যেন তিনি বানান শয়তান যা প্রক্ষেপণ করে তাকে পরীক্ষার বস্তু ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য যাদের হৃদয়ে রয়েছে মরয এবং কঠোর হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য। আর নিঃসন্দেহে যালিমরা দূরবর্তী হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে। ***আর (ঐ পরীক্ষাটা করেন) যেন জেনে নেয় ঐ সকল ব্যক্তিরা যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে যে, তা হকই আপনার রবের পক্ষ থেকে। অনন্তর যাতে ঈমান আনে তারা তার প্রতি এবং তাদের হৃদয় বিগলিত হয় তার জন্য। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ পথ দেখাবেন যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সঠিক পথ।***'[১৫৬]

"তোমরা মাগরিবের নামাযের মতো করে তিন রাকাত বিতরের নামায পড়ো না।" –দারকুতনী, হাদীস ১৬৫০, ২/৩৪৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৪২৯ যেভারে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
উপরোক্ত হাদীস, যার ভিত্তিতে তিনি নিজের বুঝ অনুসারে দুই জলসা, এক সালামের সঙ্গে তিন রাকাত বিতরের পদ্ধতি ত্যাগ করাকে জরুরি বলছেন এই হাদীসের পাঠ তারই উদ্ধৃত নম্বরে দারাকুতনী ও সহীহ ইবনে হিব্বানে এভাবে আছে–

لا تُوْتِروا بثلاثٍ، أَوتِرُوا بخمسٍ، أو بسبعٍ، ولا تشبَّهوا بصلاة المغربِ

"তোমরা বিতর (শুধু) তিন রাকাত পড়ো না। পাঁচ বা সাত রাকাত পড়। মাগরিবের সঙ্গে সামঞ্জস্য গ্রহণ করো না।"
লেখক এই হাদীসের মাঝে থেকে أَوتِرُوا بخمسٍ، أو بسبعٍ বাক্যটি বাদ দিলেন কেন? আসলে হাদীসের এই বাক্যগুলো দ্বারা, সহীহ সনদে বর্ণিত এই হাদীসের অন্যান্য পাঠ এবং এ বিষয়ের অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা এই হাদীসের মর্ম পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে, তোমরা বিতর শুধু তিন রাকাত পড়ো না, বরং এর আগে তাহাজ্জুদ হিসাবে দুই রাকাত নফল বা চার রাকাত নফল নামায অবশ্যই পড়। ...
সামান্য চিন্তা করলেই যেকোনো পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, সামঞ্জস্য থেকে বাঁচার জন্য দুই রাকাতের পর জলসা ছাড়তে হবে কেন? দুআ কুনূত দ্বারাও তো দুই নামাযে পার্থক্য হচ্ছে।'
উম্মাহর ঐক্য পথ ও পন্থা পৃ. ১৯৮-১৯৯
বাংলাভাষায় এ কিতাব অদ্বিতীয়। আমাদের জানামতে, এতটা অতলস্পর্শী করে ইলমী বিষয়ে বাংলার পাঠকদের জন্য এমন গবেষণাগ্রন্থ কেউ উপহার দেন নি। প্রত্যেক তালিবে ইলম ভাইয়ের জন্য উচিত– এ কিতাব বারবার ফিকির করে করে পড়া। ***আল-মাদখাল*** বলি আর ***ওয়াহদাতুল উম্মাহ*** বলি, ***মুহাযারাত*** বলি আর ***আল-ওয়াজীয*** বলি, প্রতিটি কিতাবই ইলমে হযরতের ইমামত সাব্যস্ত করে ছেড়েছে। আল্লাহ হযরতকে অত্যন্ত সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

১৫৬ সূরাতুল হজ্ব, আয়াত নং : ৫২-৫৪

﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۞ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞﴾.

আহলে ইলম যেমন অনেক সংশয়-সন্দেহের মাঝ থেকে সঠিক কথা বের করে আনতে পারবেন। তেমনি সঠিক কথার সামনে তারা সর্বদা নত থাকবেন। কুরআনে উল্লেখিত আলিমদের জন্য এ দু'টি গুণ অপরিহার্য।

যে যা বলে তা-ই অন্ধ বিশ্বাস করা, শুধু মুমিনই নয়, বরং যে কোনো বুদ্ধিমানের জন্যও উচিত নয়। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এ বিষয়ে কত সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করেছেন। শুধু এই নির্দেশনাটুকু না মানার কারণে আজ আমাদের মাঝে কত ফিতনা, ভাবতেই মনটা যেন বিষিয়ে উঠে।

এমনও হয়, আমাদের লেখক ঐ আলেমের কথার মর্ম নিজের ভাষায় নকল করেছেন। এ ক্ষেত্রে কখনো নকলকারীর ভাষা ঐ আলেমের ভাষার চেয়ে সুন্দর ও আবেদনশীল হয়ে থাকে। আবার বিপরীতও হয়।

কখনো লেখক মুখস্থ বলে দেন। এই হাদীস অমুক অমুক কিতাবে আছে। আসলে হাদীসটি অমুক কিতাবে নেই। আছে অন্য কিতাবে। মুখস্থ লিখতে গিয়ে এ সকল ভুল বেশি হয়।[১৫৭]

কোনো সময় এমনও হয়– লেখক যে কিতাব থেকে কথা নকল করছেন সে কিতাবের লেখক আরো বেশ আগে থেকে অন্য কোনো আলেমের কথা নকল করে আসছেন। আমাদের লেখক পিছন থেকে কথা না দেখার কারণে মনে করেছেন এটা সেই লেখকের কথা, যার কিতাব থেকে তিনি নকল করছেন। ফলে একজনের বক্তব্যকে আরেকজনের বক্তব্য বলে ধারণা করেছেন এবং কিতাবে তা-ই লিখে দিয়েছেন।[১৫৮]

---

১৫৭ একটি উদাহরণ দেখুন, হযরত শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা (দামাত বারাকাতুহুম) লিখিত *আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসায়িলিল ইলমি ওয়াদ-দ্বীন* গ্রন্থে, পৃ. ৮৮-৮৯ (মতন ও টীকা)। আরেকটি দেখুন– ইবনুল 'আরাবীর *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থে ১/৫৪ (টীকাসহ)। দারু ইবনুল জাওযীর ছাপা।

১৫৮ হাফেয যাইলাঈ (*নাছবুর রায়াহ* ৪/১৭৪) একটি হাদীস বিষয়ক আলোচনা হাফেয ইবনে আবদিল হাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)-এর দিকে নিসবত করেছেন। কারণ, তিনি কথাটি

عليه في «صحيح مسلم» تلميذٌ لأحدِ تلامذتي، جزاه الله خيرًا، فوجدتُه كما قال الإمام السيوطي عليه الرحمةُ والرضوان.

'একবার আমি মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *আর-রফ'উ ওয়াত-তাকমীল*-এর টীকায় লিখেছিলাম, অমুক হাদীস *সহীহ মুসলিমে* নেই। অথচ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আছে বলে হাওয়ালা দিয়েছেন হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। হাদীসের সূচীপত্র বিষয়ক কিতাবাদি দেখেই আমি এমনটি করেছিলাম। পরে আমার এক প্রশিষ্য আমাকে বললো, হাদীসটি **সহীহ মুসলিম**-এর অমুক অধ্যায়ে আছে। কিতাব খুলে দেখতে পেলাম হাফেয সুয়ূতী যেমন বলেছেন, হাদীসটি তেমনি **সহীহ মুসলিম**-এ বিদ্যমান! আল্লাহ তা'আলা হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতীর প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।'[১৬০]

অনেকের অভ্যাস (আল্লাহ মাফ করুন), এক-দুই কিতাব দেখেই বলে দিবে, আমি শত শত কিতাব দেখে বিষয়টি পাই নি। অথচ হাতের নাগালেই রয়েছে এই তথ্য। এটা ইলমী আমানতের বিপরীত। আর যারা বিদ'আতপন্থী তাদের কথা যাচাই-বাছাই ছাড়া বিশ্বাস করা মোটেও যৌক্তিক নয়। তারা কোনো কিতাব না দেখেই বলে দেয়, অমুক হাদীস জাল। অমুক হাদীস সঠিক নয়। অথচ হাদীসটি *সহীহ বুখারী*তে বিদ্যমান!

একজন প্রসিদ্ধ মানুষ তো নিজের মত সাব্যস্ত করার জন্য *সহীহ বুখারী*র হাদীস জেনেও কালাম করেছেন। দলিলের আলোকে হাফেয আবু বকর খতীব বাগদাদী *আল-ফাকীহু ওয়াল-মুতাফাক্কিহু* কিতাবে, হাফেয শামসুদ্দীন ইবনুল কায়্যিম *ই'লামুল মুওয়াক্কীঈন* গ্রন্থে এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কেয়াসের হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। অথচ ইবনে হায্ম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছেন,

ومِن الباطل المقطوع به أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ.

আল্লামা যাহেদ কাউসারী ছাহেব ইবনে হায্ম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা-এর কিতাব *আন-নুবায ফী উসূলিল ফিকহিয যাহিরী*-এর টীকায় অনেকটা বিস্তারিত খণ্ডন

১৬০ হাফেয ইবনে আবদিল বার (মৃত ৪৬৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত *আল-ইনতিকা*, পৃ. ২৪৮। আরো দেখা যেতে পারে মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম রচিত *আল-মাদখাল* ৯৯ (তৃতীয় সংস্করণ), ১২৯ (চতুর্থ সংস্করণ)।

করেছেন। কাউসারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *মাকালাত* গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ রয়েছে।

***

মুরাজা'আতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কোনো আলেম কিছু বললে বা লিখলে সে শাস্ত্রের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ কোনো আলেমের শরণাপন্ন হওয়া। যারা কোনো ফন নিয়ে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করেছেন তারা জানেন, কখনো কখনো এমন হয়, মুরাজা'আত ছাড়া কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের কথাও গ্রহণ করা মুশিকল হয়ে পড়ে। কারণ, সে ফনে ঐ আলেম মারজি' হতে পারেন না; আদামে বাছীরত বা তাসাহুলের কারণে। এই মুরাজা'আত আমরা কোনো আলিমের সঙ্গে সরাসরি করতে পারি। মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের শুরূহের মাধ্যমেও হতে পারে। মুহাক্কিকুল ফনের টীকার মাধ্যমেও এই মুরাজা'আত করা যায়। ফনের অন্যান্য মুতকান কিতাব ঘেঁটেও এ কাজ সমাধা করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি **আল-হিদায়া** গ্রন্থের সঙ্গে **ফাতহুল ক্বদীর** অধ্যয়ন করুন। হাফেয ইবনু জাওযীর **আত-তাহকীক**-এর সঙ্গে হাফেয ইবনু আবদিল হাদী হাম্বলী লিখিত এর টীকা **তানকীহুত তাহকীক** দেখুন। **তাফসীরে জালালাইন**-এর সঙ্গে ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) লিখিত ***তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*** পড়ুন।[১৬১]

মুরাজা'আতের এ প্রকারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টই যে, এ জন্য তালিবে ইলমের প্রথম কর্তব্য হলো, আহলে ফন উলামায়ে কেরামকে চেনা। তাদের তবাকাত জানা। এ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। ফিক্বহী মাসআলায় আপনি ***ফাতহুল ক্বদীর***-এর কথা ***আল-বিনায়া***র মাধ্যমে যাচাই করবেন না। কারণ, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম ছাত্র হলেও তাঁর

---

১৬১ এর পর দেখতে পেলাম আমাদের দেশে কুরআন-সুন্নাহর ইমাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন, 'তাফসীরে জালালাইনের সাথে তাফসীরে ইবনে কাসীর আপনার মুতালাআর অন্তর্ভুক্ত রাখুন। এতে যেমন درايۃ ও روايۃ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আসার এবং আরবী ভাষা ও তাফসীরের নীতিমালার আলোকে তাহকীকীভাবে কুরআন কারীমের মর্মার্থ বুঝে আসবে, তেমনি তাফসীরে জালালাইনের কোথাও কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে।' ***তালিবানে ইলম পথ ও পাথেয়*** পৃ. ৩৪৫
এই গ্রন্থটির ফায়েদা ও বরকত থেকে কোনো তালিবে ইলম ভাইয়ের বঞ্চিত থাকা কাম্য নয়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে– তালিবানে ইলমের নির্দেশনায় এর চেয়ে সুন্দর কোনো গ্রন্থ বাংলাভাষায় এখনো পর্যন্ত রচিত হয় নি। **এভাবে পড়ুন**-এর লেখকের যদি ইলমী সামান্যও রুচি পয়দা হয়ে থাকে, তাহলে সর্বপ্রথম এর পেছনে যে ব্যক্তি ও কিতাব কার্যকরী ছিল, তা হল– **তালিবানে ইলম পথ ও পাথেয়** এবং এর মুহতারাম লেখক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম, যাকে আমার দুর্বল কলমের কালিতে চিত্রায়িত করা একেবারেই অসম্ভব। আল্লাহ হযরতকে শায়ানে শান জাযা দান করুন। আমীন।

উস্তাদ বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা-এর চেয়ে তাঁর ফিকহী মান উন্নত। প্রতিটি শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একই কথা। এ জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উস্তাদের অনুগত সোহবত ও সুদীর্ঘ অধ্যয়ন।

***

আমাদের তালিবে ইলম ভাইদের মাঝে কিছু অভিধান খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব* ও *আর-রাইদ*। অনেক সময় আমাদের তালিবে ইলম ভাইয়েরা কুরআন বা হাদীসের কোনো শব্দ তাহকীক করতে হলে এসব অভিধানের দিকে রুজু' করেন। এতে তারা অনেক ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হোন। এছাড়াও এসব অভিধান দেখে আরবীভাষা-জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এসব অভিধানে হাকীকী ও মাজাযী অর্থের কোনো পার্থক্য নেই। অন্য শব্দের সঙ্গে ফরকের কী কী দিক আছে তা-ও লেখা নেই। অভিধান-লেখকদের দোষ নয়। আমরা তাদের কাজের গলদ ইস্তেমাল করছি। এটা আমাদের দোষ।

আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব একটি গবেষণাধর্মী অভিধান। কিন্তু এটা বুঝতে হলে কয়েকটি অভিধানে একটি শব্দ ঘেঁটে এর দিকে রুজু' করতে হবে। আপনি *আস-সিহাহ*, *আল-কামূসুল মুহীত* ও *লিসানুল 'আরব* অভিধানগুলোতে একটি শব্দ দেখে এ অভিধানে দেখুন, বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের আরবীভাষার প্রাথমিক তালিবে ইলম (নাহবেমীর ও হেদায়াতুন্নাহুর ছাত্র) ভাইয়েরা যে *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব* ব্যবহার করেন, আরবীভাষার শেষ স্তরের তালিবে ইলম ভাইয়েরাও একই অভিধান ব্যবহার করেন। অন্যান্য ফনের ক্ষেত্রে তালিবে ইলম যেমন নিজের ইলমী স্তর হিসেবে উর্ধ্বে আরোহন করতে থাকে, এখানেও কি তেমন হওয়ার কথা নয়?

কুরআনের শব্দ বোঝার জন্য কুরআনের অভিধানকেই শেষ মারজি' হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।[১৬২] হ্যাঁ, তাফসীরের যেসব কিতাবের লেখক সাহাবা-তাবেয়ীনের সূত্রে শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, কিংবা যেসব লেখকগণ নিজেরাও ভাষার ইমাম ছিলেন, তাদের কথাও এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে বিনা দ্বিধায়।

এ সত্ত্বেও একজন পরিশ্রমী প্রতিভাবান তালিবে ইলমের কর্তব্য হল– একটি শব্দের অর্থ বোঝার জন্য প্রথমে গ্রহণযোগ্য অন্যান্য অভিধান দেখে নিজেই একটি অর্থ নির্ণয় করা। তবে নিজের বুঝকে সর্বশেষ ফায়সালাকারী মনে না করা। কিছু বোঝার পর

---

১৬২ এর অর্থ এ নয়– সকল শব্দের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের সকল অভিধানকেই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। বরং বিভিন্ন অভিধান মুরাজাআ'ত করলে কখনো কোনো অভিধানের কোনো শব্দ ভুলও হতে পারে এবং হয়ও। এ কিতাবেও এর কিছু নমুনা উঠে এসেছে।

তাফসীর ও গরীবুল কুরআন বিষয়ক কিতাবাদি দেখা। এতে নিজের বুঝ ভুল প্রমাণিত হতে পারে। আবার সঠিকও হতে পারে। এভাবে বোঝার যোগ্যতা পয়দা হবে।

***

আরেকটি ক্ষেত্রে মুরাজা'আতের খুবই প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা মুরাজা'আত খুবই কম করি। সেটা হল– কখনো কখনো কোনো আলিম বা ইমাম ইস্তিকরা ও বিস্তর তাহকীক করে একটি নীতি বলেন। আমরা তখন নীতিটি তো মুখস্থ করি। কিন্তু এর মুরাজা'আত করি না।

দু'একটি উদাহরণ দেখুন :

কুরআনুল কারীমে দু'আর আয়াতগুলো অনেক ক্ষেত্রেই এভাবে এসেছে–

﴿رَبَّنَا وَآتِنَا﴾

অর্থাৎ অতিরিক্ত 'ওয়াও' এসেছে। এ ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান হল– সৎ ব্যক্তিদের দু'আর ক্ষেত্রেই কুরআনে তা ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন :

সূরা বাকারা, আয়াত নং : ১২৮, ১২৯, ২৮৬
সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং : ১৯৪
সূরা মুমিন, আয়াত নং : ৮

আরেকটি অনুসন্ধান দেখুন। কুরআন মাজীদে এমন বেশ কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলো আমাদের মাঝে প্রচলিত অর্থে নেয়া হলে অনেক নসে অর্থগত বিকৃতি ঘটা সুনিশ্চিত। যেমন كلمة، حق، قول، فسق، وحي، كتاب ইত্যাদি। কুরআন মাজীদে এগুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে– এই অনুসন্ধান-নির্ভর ফায়সালা অধিকাংশ সময় আধিক্যের ভিত্তিতে হয়। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীত কিছু পাওয়া গেলে ঐ অনুসন্ধান অপূর্ণ বা ভুল সাব্যস্ত হবে না। এর একটি নমুনা আপনি ইবনুল ফারাস আন্দালুসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কথায় পড়ে এসেছেন।

প্রিয় তালিবে ইলম ভাই হয়ত বুঝে গেছেন– সকল কাওয়ায়েদ ও উসূল অনুসন্ধান নির্ভর। আমাদের অনেক বড় দুর্বলতা হল, আমরা কাওয়ায়েদ ও উসূলকে কখনো অনুসন্ধান করে দেখি না। যেভাবে বড়রা অনুসন্ধান করে লিখেছেন, সেভাবে অনুসন্ধান করে না বোঝার কারণে আমাদের ইলম পাকাপোক্ত হয় না। আবার কখনো কায়দাকে এমন স্থানে প্রয়োগ করে বসি, যেখানে কায়দা প্রয়োগ করা স্পষ্ট ভুল।

যেমন সাধারণ নীতি হল– ছিকা ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর হাদীস ছহীহ হবে। কিন্তু আমাদের অনেক ভাই মনে করে বসেন, ছিকা রাবীর সব হাদীসই ছহীহ।[১৬৩] তাই সনদের রাবী ছিকা হলে হাদীসকে ছহীহ বলে দেন! অথচ এই হাদীসকে বড় বড় ইমামগণ ভুল বলেছেন! কখনো তো জেনেও ইমামগণের বিপরীতে অন্ধের লাঠি আমরা দাঁড় করিয়ে দেই!! আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

***

অনেক কিতাবে পাবেন, লেখক বলছেন, 'কোনো কোনো আলিম বলেছেন', কিংবা, 'বলা হয়' ইত্যাদি বাক্য, যাতে মূল বক্তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না। এভাবে অস্পষ্টভাবে যেমন অনেক মুতকান কথা নকল করা হয়, তেমনি অনেক গলদ কথাও নকল করা হয়। আপনি যদি বিভিন্ন কিতাব মুরাজা'আত করেন তাহলে মূল বক্তা খুঁজে পাবেন। এতে আপনি ঐ বক্তার ইলমী স্তর বুঝতে পারবেন। গ্রহণ ও খণ্ডন; উভয় থেকেই আপনি তার ইলমী মাকাম অনুমান করতে পারবেন। ঐ বক্তা ইলমে বিশেষ অগ্রগণ্য না হলে কোনো মুহাক্কিক তার কথা খণ্ডন করবেন না।

আপনি মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***ফাতহুল ক্বদীর*** থেকে বেশ কিছু অংশ অধ্যয়ন করে থাকলে জেনে থাকবেন, তিনি 'বলা হয়েছে' বা 'কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন' বলে ইমাম ফাখরুদ্দীন যাইলাঈ (মৃত ৭৪৩ হি.), ইমাম আকমালুদ্দীন বাবিরতী (মৃত ৭৮৬ হি.) ও হাফেয বদরুদ্দীন 'আইনী (মৃত ৮৫৫ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর কথাকে খণ্ডন করেন। হ্যাঁ, কিতাবের শুরুর দিকে 'আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথার খণ্ডন পাওয়া যায় না। কারণ, তিনি মুহাক্কিক সাহেবের বেশ পরে কিতাব লেখা শুরু করেছেন এবং শেষও করেছেন মুহাক্কিক ইবনুল হুমামের বহু পূর্বেই।

***

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার সময় আপনি যদি শব্দে শব্দে মুফরাদাত-বিষয়ক কিতাব মুরাজা'আত করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন শব্দ কিতাবটিতে ছুটে গেছে। উদাহরণস্বরূপ– ***মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন*** গ্রন্থের উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদের সব শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া। তিনি যেভাবে 'ইসতিকছা' করেছেন, তা থেকে এটাই বোঝা যায়।[১৬৪] একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, এ

---

১৬৩ শেষ যুগের অনেক মুহাদ্দিসও এ ভুলের শিকার হয়েছেন। যদিও প্রাচীন ইছতিলাহ অনুযায়ী মুহাদ্দিস খুঁজে পাওয়া দুষ্করই বটে। আমরা যদি 'ইলালুল হাদীস ও রিজালুল হাদীস সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করতাম, তাহলে এ ভুলের শিকার হতাম না। ***যফারুল আমানী*** ২৮-২৯

১৬৪ পরে দেখতে পেলাম– কিতাবের ভূমিকায়ও তিনি সুস্পষ্টরূপে এ কথা বলেছেন। আমাদের লাজনার এক সঙ্গী এ কথার উপর ইশকাল করেছিল। তাই ভূমিকার হাওয়ালা দিয়ে দেয়া হল।

গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে লেখক সমুদ্র সাতরে পাড়ি দেয়ার মত কষ্ট করেছেন! বহু স্থানে এত সুন্দর সুন্দর তাহকীক ও ইসতিকরা পেশ করেছেন, নিজের অজান্তেই হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া এসে যায়! তাঁর কষ্ট-মোজাহাদা ও তাহকীক-গবেষণার কারণে ঘাড়টা এমনিতেই নুইয়ে আসে।

কিন্তু মানুষের সব কাজই সীমিত। তাই আপনি এমন অনেক শব্দ পাবেন যেগুলোর অর্থ ***মুফরাদাত*** গ্রন্থে উল্লেখ নেই। কখনো তো মূল শব্দই উল্লেখ করেন নি। কখনো মূল শব্দ উল্লেখ করলেও কুরআনের উদ্দিষ্ট কোনো অর্থ ছুটে গেছে। আবার কখনো মারজূহ অর্থ বলেই ক্ষ্যান্ত হয়েছেন।(১৬৫)

মুরাজা'আতের মাধ্যমেই আপনি জানতে পারবেন– সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশের অর্থ ***লিসানুল 'আরব*** ও ***তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*** গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

নিম্নে কিছু উদাহরণ দেখুন——

(إِذْنٌ) শব্দের একটি প্রসিদ্ধ অর্থ– অনুগ্রহ ও সাহায্য করা। তিনি এ অর্থটি উল্লেখ করেন নি। অথচ এ অর্থে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে।(১৬৬)

(أُمٌّ) শব্দটির একটি অর্থ বিরাট ও মহান। তিনি শব্দটির অন্য অর্থ উল্লেখ করলেও এ অর্থটি উল্লেখ করেন নি।(১৬৭)

(بَعَثَ) শব্দটির একটি অর্থ হল– দাঁড় করানো এবং কোনো পদে কাউকে বসানো। লেখক অন্যান্য অর্থ উল্লেখ করলেও এ অর্থ দু'টি উল্লেখ করেন নি।(১৬৮)

(إِثْبَاتٌ) শব্দটির একটি অর্থ বলেছেন 'পিছিয়ে দেয়া এবং পেরেশান করা'। তিনি অর্থটিকে একটি আয়াতের উপর প্রয়োগ করেছেন। অথচ ঐ আয়াতের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, আয়াতে শব্দটির অর্থ হল, আটকে রাখা।(১৬৯)

---

১৬৫ এর পর আল্লাহ আমাদের মাদরাসাতুন নূরের বরকতে ***'উমদাতুল হুফ্ফায*** সংগ্রহ করার তাওফীক দান করেছেন। ভূমিকায় দেখতে পেলাম– সামীন হালাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিষয়টি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। তিনি বারটি মাদ্দাহ দেখিয়েছেন, যেগুলোর কোনো শব্দ লেখক রাগেব আসফাহানী উল্লেখ করেন নি। আরও আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন। আমাদের লেখা উদাহরণগুলোর মধ্য হতে তিনি শুধু একটি শব্দই উল্লেখ করেছেন। ***'উমদাতুল হুফ্ফায*** ১/৩৮-৩৯

১৬৬ **মুফরাদাত** পৃ. ২৪

১৬৭ **মুফরাদাত** পৃ. ৩৩

১৬৮ **মুফরাদাত** পৃ. ৬৩

১৬৯ **মুফরাদাত** পৃ. ৮৪

(جيبٌ) শব্দটির অর্থই তিনি উল্লেখ করেন নি।[১৭০]

استَحقّ ও حَصبٌ শব্দ দু'টি তো তিনি মোটেও উল্লেখ করেন নি।[১৭১]

আল-হামদুলিল্লাহ, এসবের আরো অনেক উদাহরণ লেখকের নোসখায় সংরক্ষিত রয়েছে। আফসোস, অনেক ভাই কিতাবটি বিভিন্ন কুতুবখানা থেকে ছেপেছেন, কিন্তু এর কয়েকটি ছাপাতেই দেখা যায়, অবহেলা ও অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। আল্লাহ মাফ করুন। কিতাবটি অতি সত্ত্বর সুন্দর তাহকীক করে ছাপানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রসঙ্গত, তাহকীকুত তুরাসের মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খেদমতও অনেক সময় বিশেষ উসূল ও নীতির আলোকে হয় না। সালাফের যে কিতাবের উদ্দেশ্য হবে ইস্তীয়া'ব বা কোনো বিষয়কে পরিপূর্ণরূপে পেশ করা, সেসব ক্ষেত্রে মুহাক্কিকুত তুরাসের দায়িত্ব হল– সে বিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে বিষয়টিকে আরো পূর্ণ করার চেষ্টা করা। এর নমুনার জন্য আমরা দেখতে পারি– হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাহকীককৃত *আত-তাসরীহ*, ড. নূরুদ্দীন ইত্‌র রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাহকীককৃত ***আর-রিহলা ফী ত্বলাবিল হাদীস*** এবং হযরত শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম-এর তাহকীককৃত ***মুসনাদু আমীরিল মুমিনীন ওমর ইবনু আবদিল আযীয*** গ্রন্থ তিনটি।

তাই আমার প্রিয় ভাইদের কাছে আবদার করব– আমি আপনাদের সঙ্গে এই কিতাবের পাতায় পরিপক্ব নিয়ত করলাম, প্রতিটি বিষয় আমি মুরাজা'আত করে পড়ার চেষ্টা করব। তৎক্ষণাৎ কোনো কারণে সুযোগ না হলে আল্লাহ চাহেন তো পকেট খাতায় টুকে রেখে পরবর্তীতে মুরাজা'আত করে নিবো। তাই আপনারাও আপনাদের ভাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ত করুন। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১৭০ **মুফরাদাত** পৃ. ১১০

১৭১ **মুফরাদাত** পৃ. ১২৭ ও ১৩৩ (অর্থাৎ শব্দটি থাকলে এখানে থাকতো)।

মুকারানা করে পড়ুন

মুকারানা অর্থ তুলনামূলক কোনো কিছু যাচাই করা। কোনো কথা বা কাজের প্রকৃত বাস্তবতা জানতে মুকারানার বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেক তালিবে ইলম ভাইয়ের উচিত, মাধ্যমিক স্তর থেকেই তুলনামূলক অধ্যয়নে অভ্যস্ত হওয়া। যারা উম্মাহর ইমাম হবে, অনুসরণীয় হবে তাদের ফরয পর্যায়ের দায়িত্ব হল– সবকিছু খুঁটে খুঁটে পড়া।

ইলম পরিপক্ব হওয়ার জন্য মুকারানা মুস্তাহাব পর্যায়ের নয়, বরং ফরয পর্যায়ের। মুকারানা জরুরী হওয়ার বিভিন্ন দিক ও স্তর রয়েছে। এখানে কিছু দিক ও স্তর আলোচনা করা হল :

মুকারানা জরুরী হওয়ার একটি বিশেষ কারণ হল– যে কোনো কিতাবে উল্লেখিত সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গ হয় না। প্রতিটি বহস পূর্ণাঙ্গ করা সাধারণত মানবিক যোগ্যতার উর্ধ্বে। আর কখনো তা কিতাবের উদ্দেশ্যেরও বিপরীত। তাই প্রতিটি মাসআলা খু-ব ভালোভাবে বুঝতে হলে একাধিক কিতাব সামনে রাখতে হবে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– কুরআন মাজীদ সাত হরফে নাযিল হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম যথেষ্ট ইখতেলাফ করেছেন। আপনি যদি ড. মুসাইদ বিন সুলাইমান তাইয়ার (হাফিযাহুল্লাহু)-এর ***আল-মুহাররার ফী উলূমিল কুরআন*** থেকে আলোচনাটি পড়েন, আপনার দিলে সুকূন পয়দা হবে না। আপনার প্রশ্ন ও সংশয় থেকেই যাবে। অথচ এ কিতাবটি সার্বিক বিবেচনায় উলূমুল কুরআন বিষয়ে লিখিত একটি ভালো কিতাব। কুরআন সম্পর্কে লেখকের জানা ও অভিজ্ঞতাও ব্যাপ্ত।

এ বিষয়টি বোঝার জন্য আপনি হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব (হাফিযাহুল্লাহু)-এর ***উলূমুল কুরআন*** পড়ে দেখুন। কী চমৎকার আলোচনা করেন! দিল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ইলম তো সেটাই যা হৃদয়কে প্রশান্ত করে দিতে পারে।[১৭২]

---

১৭২ হযরত শাইখুল ইসলাম ছাহেব এ অধ্যায়টি লিখতে গিয়ে কেমন মেহনত করেছেন, তা হযরতের জীবনীতে উঠে এসেছে। তিনি বলেন, 'এ লেখায় আমার সর্বাপেক্ষা মেহনত করতে হয়েছে সাব'আতু আহরুফ সম্পর্কে। এ বিষয়টি আমার জন্য রীতিমত চিন্তাগত অস্থিরতা ও পেরেশানীর

***

মুকারানা জরুরী হওয়ার আরেকটি দিক হল– কখনো কখনো দেখা যায় লেখক আলোচ্য মাসআলাটি পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করেন না। অগ্রগণ মতকে দলিল দিয়ে সাব্যস্ত করেন না। এতে পাঠকের সংশয় থেকে যায়। বিশেষত লেখকের মতামত বোঝা কঠিন হয়ে যায়। যারা অত্যন্ত সচেতন পাঠক তাদের অবশ্য ভিন্ন। তাদের অবস্থা তো এই– দেখামাত্রই তারা ম্যাপআপ চিটচিটে নারীকে প্রকৃত লাবণ্যময়ী থেকে আলাদা করে ফেলতে পারে খুব সহজেই। মারজূহ মতকে যতই দলিল দিয়ে বিস্তারিত লেখা হোক সঠিক কথা বের করতে তাদের মোটেও বেগ পেতে হয় না।

একটি উদাহরণ দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾

'বরং তোমরা চাও প্রশ্ন করতে তোমাদের রাসূলকে যেমন প্রশ্ন করা হয়েছিল মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে ইতিপূর্বে।'[১৭৩]

ছা'আলিবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যমীরুল খিতাব নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন,

---

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখি। এ বিষয়ে যেখানে যা পেয়েছি বিশ্লেষণ করতে থাকলাম এবং হজম করার চেষ্টা করলাম। টানা কয়েক মাস পরিশ্রম করার পর আল-হামদুলিল্লাহ বিষয়টি পূর্ণতায় পৌঁছায়। কিন্তু তারপরও নিজ বুঝ-সমঝের উপর আমার ভরসা ছিল না। আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না, আমি সঠিক বুঝেছি কি না।

আমি হযরত মাওলানা কারী ফাতাহ মুহাম্মাদ ছাহেবের শরণাপন্ন হলাম। তিনি কেরাত শাস্ত্রে এ সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় ইমাম। আরয করলাম, এ বিষয়ে যা-কিছু লিখেছি তা যতক্ষণ আপনার সামনে পেশ না করি এবং আপনি যতক্ষণ এর সত্যায়ন না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আশ্বস্ত হতে পারব না।

... ইশার নামাযের পর আমি তাকে সম্পূর্ণ অধ্যায়টি পড়ে শোনালাম। হযরত অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতে থাকেন। সম্ভবত কোনো কোনো জায়গায় কিছু পরামর্শও দিয়েছিলেন। মৌলিকভাবে এ লেখায় যে মত অবলম্বন করা হয়েছিল, তিনি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

কিরাত শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা জাযারী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর রচনা *আন-নাশর* গ্রন্থে লিখেছেন, আমি সাব'আতু আহরুফের ব্যাখ্যায় বিশ বছর চিন্তা-ভাবনা করেছি। তারপর এ বিষয়ে কলম ধরেছি। আমার জানামতে হযরত মাওলানা কারী ফাতাহ মুহাম্মাদ ছাহেব নিঃসন্দে এ যুগের আল্লামা জাযারী ছিলেন। তাঁর সমর্থনের পর আল-হামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে আমার পরিপূর্ণ সন্তোষ ও স্বস্তি অর্জিত হয়ে যায়। তাই লেখাটিকে *উলূমুল কুরআন*-এর অংশ বানিয়ে দিই।' *আমার জীবনকথা* ২/২৮৭-২৮৮ (ঈষৎ পরিবর্তনের সঙ্গে)।

১৭৩ সূরা বাকারা, আয়াত : ১০৮

قال أبو العالية: إنَّ هذه الآيةَ نزلت حين قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتَ ذنوبنا جرتْ مجرى ذنوب بني إسرائيل في تعجيل العقوبة في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطاكم الله خيرًا مما أعطى بني إسرائيل.

وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهم: سببُها أن رافع بن حُريملة اليهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم تفجير عيونٍ وغير.

وقيل: غيرُ هذا.

'আবুল 'আলিয়া বলেন, কোনো কোনো ছাহাবী নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন, বনী ইসরাঈলের মত যদি আমাদের গুনাহের শাস্তিও দুনিয়াতে দেয়া হতো, ভালো হতো। তখন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেটাই বেশি উত্তম। এরই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, আয়াতটির প্রেক্ষাপট হল– ইহুদী রাফে' বিন হুরায়মালা নবীজীকে বলল, আমাদেরকে ঝরনা উৎসারিত করে দেখান।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন কিছুও বলা হয়।'[১৭৪]

এবার সংক্ষেপে ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আলোচনাটি পড়ে দেখুন–

اختلفوا في المخاطَب به على وجوهٍ:

أحدها: أنهم المسلمون، وهو قولُ الأصمِّ والجبائي وأبي مسلم، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: أنه تعالى قال في آخر الآية: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ﴾، وهذا الكلام لا يصح إلا في حق المؤمنين. الثاني: أن قوله ﴿اَمْ تُرِيْدُوْنَ﴾ يقتضي معطوفًا، وهو قوله ﴿لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا﴾، الثالث: أن المسلمين

---

১৭৪ *আল-জাওয়াহিরুল হিসান* ১/৩০০

كانوا يسألون محمدًا صلى الله عليه وسلم عن أمورٍ لا خير لهم في البحث عنها/. ...

القول الثاني: أنه خطابٌ لأهل مكة، وهو قول ابن عباسٍ ومجاهدٍ. ...

القول الثالث: المراد اليهودُ. وهذا القول أصحُّ؛ لأن هذه السورة من أول قوله ﴿يَبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ﴾ حكايةٌ عنهم، ومحاجة معهم؛ ولأن الآية مدنية، ولأنه جرى ذكر اليهود، وما جرى ذكر غيرهم.

'এই আয়াতে সম্বোধিত কারা– এ বিষয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম মতবিরোধ করেছেন।

প্রথম মত : আয়াতের সম্বোধন মুসলমানদের প্রতি। আছম্ম, জুব্বাঈ ও আবূ মুসলিম এ মতই পোষণ করেছেন। এর স্বপক্ষে তারা বিভিন্ন দলিল দিয়েছেন।

- আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'আর যে গ্রহণ করবে কুফুরিকে ঈমানের পরিবর্তে।' এটা তো শুধু মুমিনদের ক্ষেত্রেই বলা চলে।
- ام تريدون-এর দাবি পিছনে কোনো মা'তূফ থাকবে। আর সেটা হল– لا تقولوا راعنا।
- মুসলমানরা নবীজীকে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতো।

দ্বিতীয় মত : আয়াতের মুখাতাব মক্কাবাসী। এটা হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের মত। ...

তৃতীয় মত : আয়াতে সম্বোধিত ব্যক্তি হল ইহুদীরা। এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। এর কারণ কয়েকটি–

- এই সূরার ৪০ নং আয়াত থেকে ইহুদীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। চলছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলিল-আদিল্লার উপস্থাপন।
- আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।
- ইতিপূর্বে ইহুদীদের আলোচনাই চলছিল। অন্য কারো আলোচনা করা হয় নি।'[১৭৫]

---

১৭৫ *মাফাতীহুল গায়ব* ২/২৬৫-২৬৬

আর যারা শুধু আহলে মক্কা বলে ক্ষ্যান্ত হয়েছেন[১৭৬] তাদের আলোচনা যেমন পূর্ণাঙ্গ নয়, তেমনি ক্রটিমুক্তও নয়। কারণ, রাজেহ মতটি একেবারেই উঠে আসে নি। যদি রাজেহ ও মারজূহ উভয়টি উল্লেখ করা হতো, হয়তো চিন্তাশীল পাঠক ফিকির করে দলিল খুঁজে নিতে পারতো। এবং এটা সহজ। এর চেয়ে অনেক সুন্দর– শুধু রাজেহ মতটি উল্লেখ করে ক্ষ্যান্ত হওয়া। যেমন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত শাইখুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি করেছেন।

***

আমরা 'কুরূ'র মাসআলা প্রথম *উসূলুস শাশী* গ্রন্থে পড়ি। কিতাবের উপস্থাপন থেকে অনেকের প্রশ্ন হয়, এই মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) কেন ইখতেলাফ করেছেন?[১৭৭] এর আগের ইমামগণ এ ক্ষেত্রে কী বলেছেন?

অথচ আপনি অন্যান্য কিতাব মুরাজা'আত করে দেখুন, উভয় দিকেই এক জামাত ছাহাবা-তাবেয়ীন রয়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ছাহাবা-তাবেয়ীন থেকে–

১. হযরত আয়েশা
২. হযরত যায়দ বিন সাবেত
৩. হযরত ইবনে আব্বাস[১৭৮]
৪. হযরত ইবনে উমর
এবং
৫. সালেম
৬. কাসিম
৭. উরওয়া
৮. সুলাইমান বিন ইয়াসার
৯. আবূ বকর বিন আবদুর রহমান
১০. আবান বিন উসমান ইবনে আফ্ফান
১১. খারিজা বিন যায়দ বিন সাবেত
১২. সাঈদ বিন মুসায়্যিব

---

১৭৬ *তাফসীরে জালালাইন* পৃ. ১৬-১৭

১৭৭ এই প্রশ্ন মূলত আমাদের অজ্ঞতার কারণেই হয়ে থাকে। এতে লেখকের সামান্যও দোষ নেই। *উসূলুশ শাশী* ইখতেলাফ বিষয়ক কিতাব নয়। তাই তাতে পূর্ণাঙ্গরূপে ইখতেলাফ উল্লেখ করা মোটেও দোষের নয়। তাই নীতিটি বুঝেশুনে প্রয়োগ করার আবদার রইলো।

১৭৮ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ভিন্ন মতটিও ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি নকল করেছেন। *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম* ১/৩৩৬

১৩. আতা বিন আবী রাবাহ
১৪. কাতাদা
১৫. ইবনে শিহাব যুহরী
ও
১৬. ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি– ইমাম শাফেয়ীর অনুরূপ মত পেশ করেছেন চারজন ছাহাবী এবং এগারজন তাবেয়ী ও ইমাম মালেক।

ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ছাহাবা-তাবেয়ীন থেকে–

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক
২. হযরত উমর
৩. হযরত উসমান
৪. হযরত আলী
৫. হযরত আবুদ দারদা
৬. হযরত উবাদা বিন সামিত
৭. হযরত আনাস বিন মালেক
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ
৯. হযরত মু'য়ায বিন জাবাল
১০. হযরত উবাই বিন কা'ব
১১. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী।

এবং তাবেয়ীদের মধ্য হতে–

১২. আলক্বামা বিন কায়স নাখাঈ'
১৩. আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ
১৪. ইবরাহীম নাখাঈ'
১৫. মুজাহিদ বিন জাব্‌র
১৬. তাউস বিন কাইসান
১৭. সাঈদ বিন জুবাইর
১৮. ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস[১৭৯]
১৯. মুহাম্মাদ বিন সীরীন

---

১৭৯ হযরত ইবনে আব্বাসের এই চারজন আকাবির শাগরেদ (মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ ও ইকরিমা) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মাযহাব থেকে বোঝা যায়– হযরত ইবনে আব্বাসের দুই কওলের মধ্যে এটাই অগ্রগণ্য।

২০. হাসান বসরী
২১. শা'বী
২২. মাকহূল
২৩. আতা খোরাসানী
২৪. কাতাদা
২৫. রবী' বিন আনাস
২৬. সুদ্দী ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান
২৭. 'আমর বিন দীনার
২৮. মা'বাদ আল-জুহানী
ও
২৯. যাহ্হাক।

এ মতকেই মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করেছেন–
৩০. ইমাম সুফিয়ান সাওরী
৩১. আওযায়ী'
৩২. ইবনে আবী লায়লা
৩৩. ইবনে শুবরুমা
৩৪. হাসান বিন সালেহ
৩৫. আবূ উবাইদ
৩৬. ইসহাক বিন রাহূয়াহ
ও
৩৭. ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)।[১৮০]

ইমাম আবূ হানীফার সমমত পেশ করেছেন এগারজন ছাহাবী, আঠারজন তাবেয়ী এবং এক জামাত ফকীহ ইমাম।

***

মুকারানা জরুরী হওয়ার আরেকটি কারণ হল– কখনো কোনো কিতাবের একটি বহস অসুন্দর থাকে। বাহ্যত এটাকে সুন্দরই মনে হয়। কিন্তু অন্যান্য কিতাব মুকারানা করে পড়লে সুন্দর-অসুন্দরের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

উসূলুশ শাশী থেকেই আরেকটি উদাহরণ দেখুন :

১৮০ *জামিউল বায়ান* (২/৫০৬-৫১৪), *মা'আনিল কুরআন*, নাহ্হাস (১/৭৫), *তাফসীরে কাবীর* (৩/৩১৭-৩১৮), *তাফসীরে কুরতুবী* (২/১০০) ও *তাফসীরে ইবনে কাসীর* (১/৩৩৫-৩৩৬)

লেখক ফাখরুল ইসলাম বাযদাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অনুসরণে 'মানহী আনহু'কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

এক. ফেয়েলে হিস্সী।
দুই. ফেয়েলে শরয়ী।

প্রথম প্রকারের ব্যাপারে বলেছেন, তা কখনো বৈধ হতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বলেছেন, তা বৈধ হবে। যদিও নিষেধের পর করাটা অন্যায়।

লেখকের এ কথার উপর প্রশ্ন হয়, মুহদিসের নামায তো কোনোভাবেই বৈধ হয় না। মাহরামের সঙ্গে কোনোভাবেই বিবাহ সম্পন্ন হয় না। স্বাধীন ব্যক্তিকে কোনোভাবেই বিক্রি করা সহীহ হয় না। এ-সবগুলোই তো ফেয়েলে শরয়ী। তাহলে তো এগুলো কোনোভাবে বৈধ হওয়ার কথা?

তিনি ফাখরুল ইসলাম বাযদাবীর মত উত্তর দিয়েছেন। এখানে নাহীকে নাফীর অর্থে ধরা হবে। সেটার দিকও তারা বয়ান করেছেন।

এবার হুসামুদ্দীন আখসীকাতী[১৮১] (মৃত ৬৪৪ হি.)রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উল্লেখিত ভাগটি দেখুন, যা মূলত শব্দে শব্দে কাযী ইমাম আবূ যায়দ দাবূসী (মৃত ৪৩০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এরই ভাগ। সেটা হল :

এক. মানহী আনহু কবীহ লিআইনিহী। এটা দুই প্রকার :

১. ফেয়েলে হিস্সী থেকে নিষেধ করা হলে সেটা কবীহ লি'আইনিহী।
২. আহলিয়্যাত কিংবা মাহাল্লিয়্যাত না থাকার কারণে যেসব শরয়ী ফেয়েল থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোও কবীহ লি'আইনিহী। এই দুই প্রকার কখনো বৈধ হয় না।

দুই. কবীহ লিগাইরিহী। এটাকেও দু'ভাগে ভাগ করেছেন। বিস্তারিত ঐসব কিতাবে দেখে নিবেন।

এখন ভাবার বিষয় হল– কোন তাকসীমটা সুন্দর? কোনো সন্দেহ নেই, দাবূসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাকসীমই বেশি সুন্দর ও উপযোগী। কিন্তু মুকারানা না করলে কিভাবে এটা বোঝা সম্ভব?

---

১৮১ ـتَ-এর উচ্চারণই অগ্রাধিকার যোগ্য। দেখুন আবদুল মাজিদ তুরকুমানী লিখিত অসামান্য গ্রন্থ *দিরাসাত ফী উসূলিল হাদীস 'আলা মানহাজিল হানাফিয়্যা* পৃ. ৮৯ (টীকা)।

***

মুকারানা জরুরী হওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল– কখনো কখনো কোনো আলোচনায় ভুল থেকে যায়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে যে কেউ তা বুঝতে পারে না। বিভিন্ন কিতাব দেখলে, তাহকীক করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। দু'একটি উদাহরণ দেখুন–

হযরত মারগীনানী (মৃত ৫৯৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওযু ভঙ্গের পরিচ্ছেদে) বলেন,

وقال زفر رحمه الله تعالى: قليلُ القيء وكثيرُه سواء، ... ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: القلس حدَثٌ.

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوءٌ، إلا أن يكون سائلاً، ... وإذا تعارضت الأخبار يُحمل ما رواه الشافعي على القليل، وما رواه زفر على الكثير. انتهى.

হযরত মারগীনানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আন্দায থেকে বোঝা যায়– তিনি (قَلْسٌ) শব্দটিকে শুধু বমি অর্থে ধরেছেন।

ইমাম মারগীনানীর সমযোগীয় বিখ্যাত ভাষাবিদ ইমাম আল্লামা মুতররিযী (মৃত্যু ৬১০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

والقَلْسُ أيضًا مصدرُ (قَلَسَ)، إذا قاء ملءَ الفم، ومنه: القلسُ حدَثٌ.

'(আল-ক্বলসু) শব্দটি (ক্বলাসা)-এর মাসদার। "ক্বলাসা" (সে বমি করেছে) তখন বলা হয় যখন মুখ ভরে বমি হয়।'[১৮২]

হিদায়ার হাশিয়ায় আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী (মৃত ১৩০৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি *মুগরিব*-এর 'ইবারত উল্লেখ করে যেন ইমাম মারগীনানীর কথার উপর

---

১৮২ *আল-মুগরিব*, মুতাররিযী ২/১৯১

ইশকাল করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের জানা মতে এখানে মুতাররিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এরই ভুল হয়ে গেছে।[১৮৩]

ভুলটা মূলত খুব সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু তারপরও তা সূক্ষ্ম ভুল হিসেবে উল্লেখ করা হলো এ জন্য যে, অভিধানে ভুল হতে পারে, আমরা যেন তা বিশ্বাসই করি না।

ভিন্ন ধরণের মুকারানার একটি উদাহরণ দেখুন–

ড. রাগেব সারজানী (হাফিযাহুল্লাহু) বর্তমানের একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। তাঁরই একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম হল– ***মাযা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল-আ'লাম***। দুই খণ্ডে ছেপেছে। এ কিতাবে তিনি ভারতের তাজমহলসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ কিছু প্রাসাদকে মুসলমানদের নির্মাণ-শিল্পের বিশেষ অবদানরূপে উল্লেখ করেছেন।

এবার তাঁর বক্তব্যটি আপনি ইসলামের মেজাজ ও উসূলের আলোকে মুকারানা করে দেখুন। তাজমহল, আল-হামরা ও অন্যান্য স্থাপনা-শিল্পে যা করা হয়েছে তা হল সৌখিনতা ও বিলাসিতা। এটা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। জাতির গরীব-দুঃখীরা না খেয়ে মরবে, আর শাসকগোষ্ঠী এমন বিলাসিতা করবে?! যে কাজে সময় নষ্ট হয়েছে, অর্থের অপচয় ঘটেছে এবং মেধার অপব্যবহার করা হয়েছে– সেসব কাজ আমাদের; ইসলাম অনুসরণকারী জাতির অবদান হয়ে যাবে? মুসলমানদের অবদান হওয়ার জন্য কি এটুকুই যথেষ্ট যে, এটা কাফের-মুশরিকদের কাছে অবদানযোগ্য কর্ম, নাকি মুসলমানদের কোনো কর্মকে অবদান হিসেবে পেশ করতে হলে প্রথমে সেটা ইসলাম-সমর্থিত হতে হবে?

উসূলেই সমস্যা। আমরা আজ বুঝে অথবা না বুঝে; উভয় অবস্থাতেই পশ্চিমা কাফের-মুশরিকদের চেতনায় প্রভাবিত। তারা যেটাকে অবদান হিসেবে দেখাচ্ছে

---

১৮৩ প্রয়োজনে নিম্নোক্ত অভিধানগুলো দেখুন : ***মুখতারুস সিহাহ***, ***আল-মিছবাহুল মুনীর***, ***আল-কামূস*** ও ***মাক্বায়ীছুল লুগাহ***। সম্ভবত মুতাররিযী ছাহেব ভাষা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের মাযহাবে মুতাআছছির হয়েছেন। যার ফলে শব্দটি তিনি তাহকীকের সুযোগ পান নি।

এ ধরণের আরও দু'টি উদাহরণ দেখুন– ***আল-কামূসুল মুহীত*** (১২৯৮) قُرْأٌ শব্দের আলোচনায়। ***আল-মিছবাহুল মুনীর*** (৩০) بدنةٌ শব্দের আলোচনায়। দ্বিতীয়টির সঙ্গে অবশ্যই দেখুন ***ফাতহুল ক্বদীর*** (২/৫৩০) বাবুল কিরানের একটু পূর্বে।

বিখ্যাত ভাষাবিদ ইমাম ***তাহযীবুল লুগাহ***-এর রচয়িতা আবূ মানছূর আযহারী (মৃত ৩৭০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে দেখুন– ***তবাকাতুল মুফাসসিরীন***, দাউদী (পৃ. ৩৪৫)। আরও দেখুন তাঁর রচিত ***তাফসীরু হুরূফিল মুখতাছার*** গ্রন্থের শুরুতে মুহাক্কিকের ভূমিকা (পৃ. ৩৪)। কিতাবের মূল অংশে দেখুন (পৃ ১৫০)।

শিক্ষার জন্য একটি কথা বলা যায়– মূলত উদাহরণটি ইমাম মারগীনানীর তাসামুহ দেখানোর জন্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল, ভুলটা তাঁর নয়, বরং মুতাররিযীর। আল্লাহ আমাদেরকে মুকারানা ও মুরাজা'আতের রুচি দান করুন। আমীন।

আমরাও সেটাকে অবদান মনে করছি এবং তাদের সঙ্গে গর্ব করার জন্য সকল পদ্ধতিই অবলম্বন করছি। ইসলাম যেটাকে অপরাধ মনে করছে সেটা কিভাবে মুসলমানের অবদান হতে পারে?[১৮৪] খলীফা মামূনের ইউনানী জ্ঞান-চর্চাকে কেউ যদি অবদান বলে, বলতে পারে। কিন্তু ইসলামের যারা ধারক-বাহক তারা কখনোই এটাকে অবদান বলতে পারেন না। কারণ, তাঁদের দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম, অনেক সূক্ষ্ম। তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন– নতুন এক ফিতনার কালো মেঘ ইসলাম-আকাশে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। খালকে কুরআনের ফিতনা কিসের ফল? মু'তাযিলাদের উৎকর্ষের মূল কারণ কী?[১৮৫]

---

১৮৪ ইমামুল আছর হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

واعلمْ أنك لا تجدُ الشرعَ إلا وهو يذمُّ البناءَ، حتّى إنه ذمَّ تزخرف المساجد أيضًا، وجعَلَ التباهي فيها من أمارات الساعة، وذلك هو منصِبُه؛ فإنه لا يقول لنا إلا نصحًا نصيحًا، ولا يبيِّنُ لنا إلا حقًّا حقيقًا، فسَدَّ علينا سبل الشياطين من كل جانبٍ.

فلو كان وسَّع فيه من أول الأمر، لَبَلغَ اليومَ حالُهم إلى حدٍّ لا يُقاس؛ فإنهم إذا فعلوا بعد هذا التضييق ما فعلوا، فلو كان الأمر موسَّعًا مصرَّحًا، لرأيت الحال ما كان، فلذا لم يرِدِ الشرعُ فيه بالتوسيع.

إلاَّ أنه يجب علينا أن لا نهدرَ المصالح الشرعية، فقد رأينا اليوم أن المساجد لو كانت على حالها في السلف، ونحن في دار الكفر، لانهدمتْ ألوفٌ منها، ولما وجدتَ لها اليوم رسمًا ولا اسمًا، فالأنسبُ لنا اليوم أن نجصص المساجد؛ لتكون شعائر الله هي العليا، ولا تندرسَ بمرور الأيام، فيغصبها الكفار، ويجعلوها نسيًا منسيًّا. والله تعالى أعلم. انتهى من كتابه «فيض الباري» ٦/٢١٥ (في آخر كتاب الاستأذان).

১৮৫ মুসলিম হিসেবে আমার চেতনা হওয়া উচিত– ইসলাম কী বলে? ইসলাম যা বলে সেটাই হবে আমার চিন্তা। সেটাই হবে আমার আদর্শ। আমার কিংবা অন্য কারো চিন্তার দুর্বল নিক্তিতে ইসলামকে মাপতে যাওয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের গলদ। আফসোস, আমাদের শত্রুরা আজ সফল হয়েছে। তারা চেয়েছিল, আমরা যেন বর্ণ ও ধর্মে ভারতীয় হলেও চেতনা ও আদর্শে আমরা হই পশ্চিমা। আহ, তাদের সে ইচ্ছে আজ পূরণ হয়েছে। মুসলিম হওয়ার দাবি আমাদের আছে। কিন্তু হায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে– এই চেতনা আমাদের নেই! যদি ইসলামের বিধান বলাও হয়, কোনোই তোয়াক্কা করা হয় না।

আল-হামদুলিল্লাহ, এরপর দেখতে পেলাম হাফেয যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জীবনীতে) বলেন,

وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم المعتزلة بالبصرة، والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها بعد المئتين، فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيًّا

***

মুকারানা করে পড়লেই একটি গ্রন্থের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক সময় একজন আলিমের লেখা পড়ে খুব ভাল লাগে। কিন্তু যাচাই করে দেখা যায়– বক্তব্যটি তার নয়। অন্য কারো। কিছু উদাহরণ দেখুন

ফাতহুল ক্বদীর-এর হাদীসী আলোচনার উৎস :

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ***ফাতহুল ক্বদীর*** গ্রন্থে *হিদায়ার* হাদীস সম্পর্কে সংক্ষেপে সুন্দর আলোচনা করেছেন। প্রতিটি তাখরীজের ক্ষেত্রে ***নাসবুর রায়াহ*** মুকারানা করে পড়লে দেখতে পাবেন, প্রায় ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি হাফেয যাইলাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আলোচনাকে তালখীস করেছেন। দু'এক জায়গা ছাড়া কোথাও স্পষ্ট বলেন নি। হয়ত চিন্তা করেছিলেন– কিতাবের শেষে বলে দিবেন।

ولم يتفق حتى مضى لسبيله

وكم حسرات في بطون المقابر

অনেক মাসায়েলে *হিদায়ার* উৎস :

হিদায়া কিতাবের অনেক আলোচনার উৎস হল শামসুল আইম্মাহ সারাখ্সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***আল-মাবসূত***। একটি নমুনা দেখুন–

সারাখ্সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

متكلما، له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل، وعرَّب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد، وخبَّ ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعةُ، فإنه كان كذلك.

وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء، فلم يُمهل، وهلك لعامه، وخوَّل بعده شرًّا وبلاء في الدين؛ فإن الأمة ما زالتْ على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيُه/ وتنزيله، لا يعرفون غير ذلك، حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق مجعول، وأنه إنما يُضاف إلى الله تعالى إضافة تشريفٍ، فأنكر ذلك العلماء، ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين. «سير أعلام النبلاء» ٤٨٩/٧-٤٩٠.

بلغَنا عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: أن امرأةً زوَّجت ابنتها برضاها، فجاء أولياؤها، فخاصموها إلى علي، فأجاز النكاح.

وفي هذا دليلٌ على أن المرأة إذا زوجتْ نفسها، أو أمرتْ غير الولي أن يزوجها، فزوجها: جاز النكاح.

وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفءٍ، فالنكاح صحيحٌ، إلا أنه إذا لم يكن كفؤا لها فللأولياء حق الاعتراض.

وفي رواية الحسن: إن كان الزوج كفؤا لها، جاز النكاح، وإن لم يكن كفؤا لها لا يجوز.

وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا يقولُ: لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفءٍ إذا كان لها ولي.

ثُم رجع، وقال: إن كان الزوج كفؤا جاز النكاح، وإلا لا.

ثم رجع، فقال: النكاح صحيحٌ، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء لها.

وذكر الطحاوي قول أبي يوسف: إن الزوج إن كان كفؤا أمر القاضي الولي بإجازة العقد، فإن أجاز جاز، وإن أبى أن يُجيزه لم ينفسخ، ولكن القاضي يُجيزه، فيجوز.

وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يتوقف نكاحها على إجازة الولي، سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء، فإن أجازه الولي جاز، وإن أبطله بطل، إلا أنه إذا كان الزوج كفؤا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه.

وعلى قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: تزويجها نفسها منه باطلٌ على كل حالٍ، ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً، سواء زوجت نفسها، أو بنتها، أو أمتها، أو توكلت بالنكاح عن الغير[১৮৬].

এবার একই মাসআলায় ছাহিবুল *হিদায়া*র 'ইবারত দেখুন–

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها وليٌّ، بكرا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف: أنه لا ينعقد إلا بولي.

وعند محمد[১৮৭]: ينعقد موقوفًا.

وقال مالك والشافعي: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً؛ لأن النكاح يُراد لمقاصده، والتفويض إليهن مخلٌّ بها.

إلا أن محمدًا يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي.

ووجهُ الجواز أنها تصرفت في خالص حقها، وهي من أهله؛ لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يُطالب الولي بالتزويج كي لا تُنسب إلى الوقاحة.

ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفؤ وغير الكفء، لكن للولي الاعتراض في غير الكفء.

---

১৮৬ *আল-মাবসূত* ২/১৯৪

১৮৭ পাঠক হয়ত লক্ষ্য করেছেন– মারগীনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এখানে শামসুল আইম্মার 'ইবারত পরিবর্তন করেছেন। শামসুল আইম্মার 'ইবারত থেকে এমন ধারণা করার সুযোগ ছিল, হয়ত এটা ইমাম মুহাম্মাদ স্পষ্ট বলেন নি। তবে তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়। মাসআলাটি যেহেতু ইমাম মুহাম্মাদ সুস্পষ্টভাবে *কিতাবুল আছল*-এ বলেছেন, তাই শাইখুল ইসলাম মারগীনানীর 'ইবারতই অধিক সূক্ষ্ম মনে হয়। সামনে আসছে– ইমাম যাইলা'ঈও মারগীনানীর মতই 'ইবারত উল্লেখ করেছেন।

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير الكفؤ؛ لأنه كم من واقع لا يُرفع.

ويروى رجوع محمد إلى قولهما[১৮৮].

একটু লক্ষ্য করে দেখুন কত সুন্দর করে সারাখ্সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর দীর্ঘ বক্তব্যকে তালখীস করেছেন! আবার নিজের পক্ষ থেকে যিয়াদাতও করেছেন! শাহকার যিয়াদাত!!

তালিবে ইলম ভাই আমার, একটু না থেমে সামনে যাবেন না! একটু ভাবুন, কত সুন্দরভাবে পুরো কথাটিকে তিনি তালখীস করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাদও দেন নি। আবার অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বৃদ্ধিও করেছেন।

সারাখ্সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা পড়ার পর যদি আমরা *কিতাবুল আছল*-এর সঙ্গে মাসআলাটি মুকারানা করি, স্পষ্ট দেখতে পাবো– সারাখ্সী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেকগুলো কথা *আল-আছল* থেকে নিয়েছেন।[১৮৯] যদিও আমরা জানি– হযরত শামসুল আইম্মাহ তাঁর *আল-মাবসূত* গ্রন্থ কুপে বন্দী থাকা অবস্থায় ইমলা করিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ মুরাজা'আত করে লিখেন নি। এমনিতেই কি বলেছিলেন–

حِفظُ الشافعيِّ زكاةُ محفوظي![১৯০]

তাবয়ীনুল হাকায়েক-এর উৎস :

তাবয়ীনুল হাকায়েক-এর প্রতিটি মাসআলা যদি *হিদায়া*র সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়, মনে হবে– এটি *হিদায়া*র সংক্ষিপ্ত শরাহ। পুরো কিতাবই *হিদায়া*র আঙ্গিকে লেখা। উপরে উল্লেখিত মাসআলাটি *তাবয়ীন* থেকেও দেখুন :

---

১৮৮ **আল-হিদায়া ২/২৯৩-২৯৪ (বাবুল আউলিয়া ওয়াল-আকফা)।**

১৮৯ وكتابُ «زادُ المعاد في هدي خير العباد» للإمام الحافظ المحقق ابن القيم (ت سنة ٧٥١ هـ) رحمه الله تعالى مِن أعظم المصنفات من كتبِ الأئمة في القرون الوسطى، ومع ذلك يقول محققًا الكتابِ: الشيخان شعيب الأرنؤوط وأخوه عبد القادر الأرنؤوط رحمهما الله تعالى في تقديمهما: «ومما يُثير الدهشة أن المؤلف رحمه الله قد ألَّف كتابه هذا في حال السفر، ولم تكن في حوزته المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبارٍ وآثارٍ تتعلَّقُ بموضوع الكتاب». انتهى.

১৯০ **কিতাবুল আছল ১০/১৯৮-১৯৯**

قال رحمه الله تعالى: «نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي».

وهـذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الروايـة، وكان أبو يوسف أولاً يقول: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي.

ثم رجع وقال: إن كان الزوجُ كفؤًا لها جاز، وإلا فلا، ثم رجع وقال: جاز، سواء كان الزوج كفؤا أو لَمْ يكن.

وعند محمد: ينعقد موقوفًا على إجازة الولي، سواء كان الزوج كفؤا لها أو لم يكن. ويُروى رجوعه إلى قولهما.

وقال مالك والشافعي: لا ينعقد بعبارة النساء أصلا؛ لقوله تعالى ﴿فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ﴾، فلولا أن له ولاية التزويج لَما مُنع من العضل.

وقال الشافعي رحمه الله: هي أبينُ آية في كتاب الله على اشتراط الولي.

ولقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدَيْ عدل.

وقد رَووا في كتبهم أحاديث كثيرةً، ليس لها صحةٌ عند أهل النقل، حتى قال البخاري وابن معين: لم يصح في هذا الباب حديثٌ، يعنى على/ اشتراط الولي.

ولنا: قوله تعالى .. ..؛ ولأنها حرة بالغة عاقلة، فتكون لها الولاية على نفسها، كالغلام، وكالتصرف في المال.

ومن الدليل على صحة مذهبنا: أن المرأة لو أقرتْ بالنكاح صحَّ، ولو لم يكن لها إنشاء العقد، لَمَا صح كالرقيق والصغار.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز في غير الكفؤ؛ لأن كثيرًا من الأشياء لا يمكن دفعُه بعد/ الوقوع.

واختـار بعض المتأخرين الفتوى بهذه الروايـة؛ لفساد الزمان.[১৯১]

মুকারানা করে পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন– কোন কোন মাসআলায় ইমাম ফাখরুদ্দীন যাইলা'ঈ ইমাম মারগীনানীর 'ইবারত পরিবর্তন করছেন। চিন্তা করলে পরিবর্তন করার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতাও জানতে পারবেন। কোন কোন মাসআলায় তিনি মারগীনানীর উল্লেখিত মুতাকাল্লাম ফীহী হাদীস তরক করে ভিন্ন দলিল দিয়েই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন। অন্য কোনো সুযোগে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

মূলত *হিদায়া*র উপর কিছু দিরাসাত লেখা হলেও সত্য কথা এই যে, *হিদায়া*র উৎসগ্রন্থ ও *হেদায়া*র অনুকরণে লিখিত গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো কিছু লেখা হয় নি। ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে– অমুক অমুক আলিম *হিদায়া*র শরাহ লিখেছেন। কিন্তু হায়, শরাহ অধ্যয়ন করে শারিহীনের মেজাজ ও রুচি এবং ইলম ও ফাহম তুলে ধরা হয় নি। শুধু মুখস্থ কিছু ব্যক্তির নাম তুলে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ মুখলিস মুতকিন ও সাদিক কোনো ভাইকে এগিয়ে আসার এবং এ বিরাট শুন্যতা অতি দ্রুত পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

***

ভুলের মূল বের করার জন্যও প্রচুর মুরাজা'আত করতে হয়। পিছনে যেতে হয়। যেতে থাকতে হয়। হাফেয ইবনুস সালাহ (মৃত ৬৪৩ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকসীমে সাব'ঈর প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর কিতাব প্রসিদ্ধ হওয়ায় কথাটি তাঁর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর পূর্বেও এ ধরণের কথা কেউ কেউ বলেছেন।

হাকেম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপূরী (মৃত ৪০৫ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা পড়ুন,

فالقسم الأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الحديث. ...

والقسم الثاني من الصحيح: الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل، رواه الثقات الحافظون إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راو واحدٌ.[১৯২]

---

১৯১ *তাবয়ীনুল হাকায়েক* ২/৪৯৩-৪৯৫

এবার শায়খ আবূ হাফস মাইয়ানিশী (মৃত ৫৮৩ হি.)-এর ‘ইবারত দেখুন,

الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب:

أصحها وأعلاها: ما اتفق على تخريجه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما./

ويتلوه ما انفرد كل واحد منهما.

ويتلوه ما كان على شرطهما، وإن لم يخرجاه في صحيحيهما.

ثم دون ذلك في الصحة ما كان إسناده حسنًا.(১৯৩)

এমন তিনটি নমুনা দেখতে পারেন হযরত ইবনে ‘আবিদীন শামী (মৃত ১২৫২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *শারহু উকূদি রসমিল মুফতী* গ্রন্থে।(১৯৪)

আরও দেখা যেতে পারে হযরতের অপর গ্রন্থ– *তাম্বীহুল উলাতি ওয়াল-হুক্কাম*। একটি ভুলের গোড়া বের করে শুদ্ধ মতটি তাহকীকের জন্যই তিনি এ বিরাট গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়দের প্রতি আদব রক্ষার ক্ষেত্রেও এ গ্রন্থটি একটি আদর্শ নমুনা। লক্ষ্য করে দেখুন– তিনি কিভাবে একটি মাসআলার প্রাচীন উৎস খুঁজে বের করেছেন। যেতে যেতে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর *কিতাবুল খারাজ* পর্যন্ত গিয়েই তবে ক্ষ্যান্ত হয়েছেন।

হযরত কাযী ‘ইয়ায মালেকী (মৃত ৫৪৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পর থেকে অনেক উলামায়ে কেরাম মু’য়ান’য়ান হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর দিকে লিকার শর্তের সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কি এটা ইমাম বুখারী থেকে সাব্যস্ত? বিস্তারিত দেখুন ড. শরীফ হাতেম বিন আরিফ আউনীর *ইজমা’উল মুহাদ্দিসীন* গ্রন্থে।(১৯৫)

১৯২ *আল-মাদখাল*, হাকেম নিশাপূরী পৃ. ৯-১১ (*তাবসেরার* সঙ্গে ছাপানো।)

১৯৩ *মা লা ইয়াসা’উল মুহাদ্দিসা জাহলুহু*, পৃ. ২৬২-২৬৩ (*খামছু রাসায়েল*-এর মধ্যে হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাহকীকে ছাপা)।

১৯৪ *শারহুল উকূদ* পৃ. ২৮-৩৭

১৯৫ *ইজমা’উল মুহাদ্দিসীন* পৃ. ৭৭-১৪৭

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন

অনেক কিতাব জীবন সফল হওয়ার পথে বিরাট সহায়তা করে। যেমন *এসো আরবী শিখি* কিতাবটি একজন তালিবে ইলমের আরবীভাষার জীবনকে সফল করার ক্ষেত্রে বিরাট সহায়তা করবে, যা অন্য অনেক কিতাব থেকে পাওয়া যাবে না। আমাকে ভাবতে হবে, এর কারণ কী? লেখক কিতাব লেখার পূর্বে দীর্ঘ সময় চিন্তা করে এ কিতাবের কাজ শুরু করেছেন। কিতাব লেখার পরও দীর্ঘ সময় নিয়ে কিতাবটি বারবার সম্পাদনা করে গেছেন। দু'চার বছর নয়, সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর তিনি এ কিতাবের পিছনে মেহনত করে গেছেন। ছোট্ট একটি কিতাবের পিছনে এত দীর্ঘ মেহনত! তাও আপন ফনে মুহাক্কিক একজন বুযুর্গ আলেমের মেহনত!

হাফেয ইবনে হাজার (মৃত ৮৫২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি জগদ্বিখ্যাত হাফেযুল হাদীস। পরবর্তীদের মাঝে এমন মানুষ মেলা ভার। তিনি এত বড় মুহাক্কিক হাফেযুল হাদীস হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ পঁচিশ বছর মেহনত করে *ফাতহুল বারী* লিখেছেন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর মেহনত!! ফলাফল কী? তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থকে ওলামায়ে কেরাম বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ মনে করেন। অথচ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকা এত দীর্ঘ যে, আল্লাহই ভালো জানেন এর সংখ্যা কত?

সবযুগের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ একই মানহাজ অবলম্বন করেছেন। ইমাম মালেক জীবনের শুরুর দিকে *আল-মুয়াত্তা* রচনা করলেও সারাজীবনই এর সম্পাদনা জারী রেখেছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল– সম্পাদনা করলে আমাদের কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পায়, আর তাঁর কিতাবের কলেবর দিন-দিন সম্পাদনার কমতেই থাকে। বিস্তারিত দেখুন হাফেয সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কিতাবে।[১৯৬]

ইমাম বুখারীর *আল-জামি'উস সহীহ* রচনার ইতিহাস দেখুন। সারাজীবনই এর তাহরীর-তানকীহ অব্যাহত রেখেছেন। হাফেয ফকীহ আবুল ওয়ালীদ বাজী (মৃত ৪৭৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *আত-তা'দীল ওয়াত-তাজরীহ লিমান খার্‌রাজা লাহুল বুখারী ফিল জামি'য়িস সহীহ*-এর ভূমিকা দেখুন। তিনি উল্লেখ করেছেন, ইমাম

---

১৯৬ *তাযয়ীনুল মামালিক বিমানাকিবিল ইমামি মালিক* পৃ. ৬৪৮-৬৪৯

বুখারীর মৃত্যুর সময়ও ***আস-সহীহ***-এর বেশ কিছু জায়গা এমন রয়ে গিয়েছিল, যাতে তিনি হাদীস উল্লেখ করেছেন, বাবের শিরোনাম কায়েম করেন নি।[১৯৭] আরও দেখুন– মুহাক্কিক ইবনুল হুমামের ***ফাতহুল ক্বদীর*** লেখার ইতিহাস। ত্রিশ বছরের বেশি ব্যয় করেছেন এই একই কিতাবের পিছনে!

আবার কখনো এমন হয়, একজন আলেম বহুদিন গবেষণা করে মাত্র কয়েকদিনে বা মাসে একটি গবেষণামূলক উচ্চতর কিতাব লিখে ফেলেন। এটা মূলত দশ-বিশ দিনের ফসল নয়। বরং দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল। নিকট অতীতে এ ধরণের একটি কিতাব হলো **আল-ইমামু ইবনু মাজাহ ওয়া-কিতাবুহুস সুনান**। কিতাবের লেখক পাকিস্তানের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নু'মানী (মৃত ১৪২০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাত্র বিশ দিনের মত অল্প সময়ে লেখক এ কিতাব লিখেছেন। হযরত শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (মৃত ১৪১৭ হি.) রহমতুল্লাহি আলাইহি বড় আশ্চর্য হয়েছেন এবং বলেছেন, 'একজন মানুষ যদি বিশ বছর গবেষণা করেও এমন একটি কিতাব লিখতে পারে, তাহলে বিশ বছরের গবেষণা সার্থক।'[১৯৮]

আমাদের উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা জিকরুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ কথা উল্লেখ করে বলেন, 'কিতাব যদিও লেখক বিশ দিনে লিখেছেন। কিন্তু এটা বিশ দিনের ফসল ছিল না। এটা ছিল নু'মানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর যুগ-যুগের সাধনা ও গবেষণার ফলাফল।'

যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম গবেষণা করে প্রত্যেক শাস্ত্রেই এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব রচনা করে গেছেন, যেগুলো ছাড়া শাস্ত্র বোঝা অসম্ভব। সেসব কিতাবের তালিকা পেশ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। শাস্ত্র পড়তে থাকলে উস্তাদদের থেকে সেগুলো ধীরে ধীরে জানা যাবে ইনশা-আল্লাহ।

মনে রাখবেন, মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি কিতাব ফিকির ও চিন্তার সহিত অধ্যয়ন করলে যে ইলম ও ফাহম অর্জন হয় তা অন্যদের শত কিতাবেও হয় না। তাই প্রত্যেক তালিবে ইলমের উচিত, উস্তাদের সোহবতে থেকে মুহাক্কিক ওলামা ও তাঁদের কিতাবাদি চেনা এবং উস্তাদ যখন যেটা যেভাবে বলেন সেভাবে অধ্যয়ন করা।

---

১৯৭ কিতাবটির নিজস্ব কপি লেখকের সংগ্রহে নেই। আরও পাঁচ বছর পূর্বে আমাদের প্রিয় শাগরেদ সাঈদুল ইসলামের কপিই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তাই কারো ধারে-কাছে কিতাবটি থাকলে মুরাজা'আত করার আবদার থাকলো। ভূমিকার একেবারে শেষ দিকে হাফেয আবূ যর হারাবীর সূত্রে তিনি কথাটি বর্ণনা করেছেন।

১৯৮ উপরোক্ত কথাটি আমাদের উসতাদজী হযরত মাওলানা জিকরুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম থেকে শ্রুত। তিনি শুনেছেন হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম থেকে।

অনেক লেখক এমন আছেন যাদের সকল কিতাব তাহকীকপূর্ণ। আবার কেউ আছেন তার কিছু কিতাব গবেষণাধর্মী হলেও অন্য কিছু রচনা এমন নয়। এখানে কিছু মহান লেখকদের তালিকা পেশ করা হচ্ছে, যাদের মোটামুটি সব কিতাব পড়ার মত। দ্বীন ও শরীয়ত বুঝতে হলে একজন তালিবে ইলমের জন্য তাঁদের কিতাব পড়া খুবই জরুরী। তবে এ ক্ষেত্রে আগ-পর নির্ধারণের দায়িত্ব প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উস্তাদের। ছাত্রদের অপরিপক্ক বুঝে ভুলের আশঙ্কা অনেক বেশি।

১. ইমাম সীবাওয়াইহ (মৃত ১৮০ হি.)।
২. ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আনছারী (মৃত ১৮২ হি.)।
৩. ইমামে রব্বানী মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী (মৃত ১৮৯ হি.)।
৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেয়ী (মৃত ২০৪ হি.)।
৫. ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈ'ন (মৃত ২৩৩ হি.)।
৬. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনুল মাদীনী (মৃত ২৩৪ হি.)।
৭. ইমাম আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইয়াযীদী (মৃত ২৩৭ হি.)।
৮. ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল (মৃত ২৪১ হি.)।
৯. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (মৃত ২৫৬ হি.)।
১০. ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মৃত ২৬১ হি.)।
১১. ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা তিরমিযী (মৃত ২৭৯ হি.)।
১২. ইমাম আবু বকর বিন আবি খায়ছামা (মৃত ২৭৯ হি.)।
১৩. ইমাম আহমদ বিন শুয়াইব নাসায়ী (মৃত ৩০৩ হি.)।
১৪. ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর তবারী (মৃত ৩১০ হি.)।
১৫. ইমাম আবু বকর ইবনে খুযাইমাহ (মৃত ৩১১ হি.)।
১৬. ইমাম আবু জা'ফর তহাবী (মৃত ৩২১ হি.)।
১৭. ইমাম আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতেম (মৃত ৩২৭ হি.)।
১৮. ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী (মৃত ৩৩৩ হি.)।
১৯. ইমাম আবূ জা'ফর নাহ্হাস (মৃত ৩৩৮ হি.)।
২০. ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাযী (মৃত ৩৭০ হি.)।
২১. ইমাম আবুল হাসান আলী বিন ওমর দারাকুতনী (মৃত ৩৮৪ হি.)।
২২. হাকেম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপূরী (মৃত ৪০৫ হি.)।
২৩. ইমাম ইবনে আবদিল বার মালেকী আন্দালুসী (মৃত ৪৬৩ হি.)।
২৪. ইমাম আবু বকর খতীবে বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হি.)।
২৫. হাফেয আবুল ওয়ালীদ বাজী (মৃত ৪৭৪ হি.)।
২৬. ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদাবী (মৃত ৪৮২ হি.)।
২৭. ইমাম শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (মৃত চারশত নব্বই দশকে)।
২৮. ইমাম রাগেব আসফাহানী (মৃত ৫০২ হি.)।

২৯. ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মাদ গাযালী (মৃত ৫০৫ হি.)।
৩০. জারুল্লাহ মাহমূদ বিন ওমর যামাখশারী (মৃত ৫৩৮ হি.)।
৩১. ইমাম ইবনে 'আতিয়্যা আন্দালুসী (মৃত ৫৪১ হি.)।
৩২. কাযী আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী (মৃত ৫৪৩ হি.)।
৩৩. ইমাম আবু বকর আল-কাসানী (মৃত ৫৮২ হি.)।
৩৪. ইমাম কাযীখান (মৃত ৫৯২ হি.)।
৩৫. শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (মৃত ৫৯৩ হি.)।
৩৬. ইমাম ইবনে রুশদ (মৃত ৫৯৫ হি.)।
৩৭. ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (মৃত ৬০৬ হি.)।
৩৮. ইমাম আবুল ফাতহ মুতারি্রযী (মৃত ৬১০ হি.)।
৩৯. ইমাম ইবনে কুদামাহ হাম্বলী (মৃত ৬২০ হি.)।
৪০. ইমাম আবুল আব্বাস ক্বরাফী মালেকী (মৃত ৬৮৪ হি.)।
৪১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত ৭২৮ হি.)।
৪২. ইমাম আবদুল আযীয বুখারী (মৃত ৭৩০ হি.)।
৪৩. হাফেয জামালুদ্দীন মিয্যী (মৃত ৭৪৩ হি.)।
৪৪. ফকীহ ফাখরুদ্দীন যায়লা'ঈ (মৃত ৭৪৩ হি.)।
৪৫. হাফেয ইবনে আবদুল হাদী হাম্বলী (মৃত ৭৪৪ হি.)।
৪৬. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.)।
৪৭. হাফেয ইবনুল কায়্যিম (মৃত ৭৫১ হি.)।
৪৮. হাফেয ফকীহ তাকীউদ্দীন সুবকী (মৃত ৭৫৬ হি.)।
৪৯. হাফেয জামালুদ্দীন যায়লা'ঈ (মৃত ৭৬১ হি.)।
৫০. হাফেয তাজুদ্দীন বিন তাকী উদ্দীন সুবকী (মৃত ৭৭১ হি.)।
৫১. হাফেয ইবনে কাসীর (মৃত ৭৭৪ হি.)।
৫২. হাফেয বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃত ৭৯৪ হি.)।
৫৩. হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী (মৃত ৭৯৫ হি.)।
৫৪. হাফেয ইরাকী (মৃত ৮০৬ হি.)।
৫৫. হাফেয ইবনে হাজার (মৃত ৮৫২ হি.)।
৫৬. হাফেয বদরুদ্দীন আইনী (মৃত ৮৫৫ হি.)।
৫৭. মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (মৃত ৮৬১ হি.)।
৫৮. হাফেয কাসিম ইবনু কুতলুবুগা (মৃত ৮৭৯ হি.)।
৫৯. হাফেয শামসুদ্দীন সাখাবী (মৃত ৯০২ হি.)।
৬০. ফকীহ ইবনে নুজাইম (মৃত ৯৭০ হি.)।
৬১. ফকীহ আলাউদ্দীন হাসকাফী (মৃত ১০৮৮ হি.)।
৬২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (মৃত ১১৭৬ হি.)।
৬৩. বাহরুল উলুম আব্দুল আলী লাখনবী (মৃত ১২২৫ হি.)।

৬৪. ফকীহ সাইয়েদ আহমদ বিন ইসমাঈল তাহতাবী (মৃত ১২৩১ হি.)।
৬৫. শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী (মৃত ১২৩৯ হি.)।
৬৬. ফকীহ ইবনে 'আবিদীন শামী (মৃত ১২৫২ হি.)।
৬৭. আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী (মৃত ১২৭২ হি.)।
৬৮. হযরত মাওলানা কাসেম নানূতুবী (মৃত ১২৯৮ হি.)।
৬৯. হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী (মৃত ১৩০৪ হি.)।
৭০. মাওলানা যহীর আহসান নীমাবী (মৃত ১৩২২ হি.)।
৭১. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (মৃত ১৩২৩ হি.)।
৭২. হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (মৃত ১৩৫২ হি.)।
৭৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (মৃত ১৩৬২ হি.)।
৭৪. শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী (মৃত ১৩৬৯ হি.)।
৭৫. শায়খ যাহেদ কাউসারী (মৃত ১৩৭১ হি.)।
৭৬. শায়খ আহমদ মুহাম্মদ যারকা (মৃত ১৩৭৫ হি.)।
৭৭. শায়খ তাহির বিন 'আশূর (মৃত ১৩৯৩ হি.)।
৭৮. হযরত মাওলানা যফার আহমাদ উসমানী (মৃত ১৩৯৪ হি.)।
৭৯. হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (মৃত ১৩৯৪ হি.)।
৮০. মুফতী মাহদী হাসান গীলানী শাহজাহানপূরী (মৃত ১৩৯৬ হি.)।
৮১. হযরত মাওলানা মুফতী শফী' (মৃত ১৩৯৬ হি.)।
৮২. হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী (মৃত ১৩৯৭ হি.)।
৮৩. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী (মৃত ১৪০২ হি.)।
৮৪. মাওলানা হাবীবুর রহমান 'আযমী (মৃত ১৪১২ হি.)।
৮৫. হযরত মাওলানা ইউসুফ লুদয়ানবী (মৃত ১৪২০ হি.)।
৮৬. হযরত শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (মৃত ১৪১৭ হি.)।
৮৭. মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নো'মানী (মৃত ১৪১৭ হি.)।
৮৮. হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী (মৃত ১৪২০ হি.)।
৮৯. হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ নো'মানী (মৃত ১৪২০ হি.)।
৯০. শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী।
৯১. শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ।
৯২. ড. হামযা আব্দুল্লাহ মালীবারী।
৯৩. ড.শরীফ হাতিম বিন আরেফ আওনী।
৯৪. শায়খ আবূ মু'য়ায তারিক।
৯৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব।
৯৬. হযরত মাওলানা হারূন বিন মুহিব্বুল্লাহ ছাহেব।
৯৭. হযরত মাওলানা ইমদাদুল হক ছাহেব।
৯৮. ড. মুসাইদ বিন সুলাইমান তাইয়ার।

৯৯. ড. মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আবূ মূসা।

এ কথা মনে করা উচিত হবে না– এত বিরাট সংখ্যক মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের এত কিতাব আমরা কীভাবে পড়ে শেষ করবো। কখনো তো প্রয়োজনের তাগিদে অন্যদের কিতাবও আমাদের পড়তে হবে। কারণ, সবার সব কিতাব সকল পাঠককে পড়তে বলা হয় নি। ফন্নী রুচি-ভিন্নতা ও ইলমের স্তর-ভিন্নতার সঙ্গে এটা কিভাবে সম্ভব?

অনেক সময় মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মূল কিতাব পাওয়া যায় না। অনুবাদ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যে কোনো ব্যক্তির অনুবাদ পড়া উচিত নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে বর্তমান আমাদের মাঝে শিথিলতা দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, আমরা বিষয়টাকে খুবই স্বাভাবিক ও লঘু দৃষ্টিতে দেখছি। তাই যে কারো কিতাব এবং যে কোনো শাস্ত্রের কিতাব অনুবাদ করার সাহস ও দুঃসাহস করা হচ্ছে। হয়তো এটা ভালো নয়। ভেবে দেখা দরকার, আমি শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর কলম হয়ে অনুবাদ করছি। তিনি যদি বাংলায় লিখতেন তাহলে কেমন লিখতেন?

একজন বিখ্যাত অনুবাদক হযরত মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর একটি কিতাব অনুবাদ করেছেন। সেখানে তিনি হযরত শাইখুল ইসলাম ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার ব্যাপারে হাফেয যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)-এর একটি বক্তব্য অনুবাদ করেছেন এভাবে–

> ‘কিছু কিছু ফতোয়ার ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছেন। যার কারণে তাকে কটুকথাও বলা হয়েছে। কিন্তু তার সেই ফতোয়াগুলো তার জ্ঞানের সমুদ্রে হারিয়ে গেছে!’

নিম্নে মূল ‘ইবারতটি তুলে দেয়া হলো। মিলিয়ে দেখুন, কয়টা অনুবাদ-বিভ্রাট ঘটেছে একটি মাত্র বাক্যে। অনুবাদের আন্দায থেকে বোঝা যায়, অনুবাদক শেষ বাক্যটির মর্ম উদ্ধার করতে পারেন নি। তাই শাব্দিক অনুবাদ করে দিয়েছেন।

وقد انفرد بفتاوى نِيْل مِن عِرضه لأجلها، وهي مغمورةٌ في بحر علمه.

‘কিছু কিছু ফতোয়ার ক্ষেত্রে তিনি সকল উলামায়ে কেরাম থেকে ভিন্ন মত পেশ করেছেন। (কিংবা– শায মত অবলম্বন করেছেন।) এ কারণে তাঁর ইজ্জত-আব্রুর উপর আঘাত করা হয়েছে। আমি মনে করি, তাঁর এই ভুল তাঁর জ্ঞান-সমুদ্রের তুলনায় বিন্দু পরিমাণই মাত্র।’

একই কিতাবের অনুবাদে বিখ্যাত মুহাদ্দিস বাকী বিন মাখলাদ, [মৃত ২৭৬ হি.] (যিনি হযরত ইমাম আহমাদ, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীনসহ বড় বড় মুহাদ্দিসদের যোগ্য শারগেদ ছিলেন রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) তাঁর নামের উচ্চারণ লেখা হয়েছে এভাবে 'বাক্বী বিন মুখাল্লাদ'।

বিখ্যাত বুযুর্গ সারী আস-সাকতী (মৃত ২৫৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (২৯৭ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শায়খ ছিলেন। তাঁর নাম আমাদের মহলে সিররী সাক্‌তী হিসাবে প্রসিদ্ধ। অনুবাদে তা-ই করা হয়েছে। আরো বেশ ভুল রয়েছে এ অনুবাদটিতে। এমনকি শায়খুল ইসলামের কিতাব **জাহানে দীদাহ**-এর নামও ভুল লেখা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় এর নাম লেখা হয়েছে **জাহাঁদীদাহ**। অথচ শায়খুল ইসলাম নিজেই এ নামের ইনকার করেছেন তাঁর অপর গ্রন্থ ***দুনইয়া মেরে আগে***-এর ভূমিকায়।[১৯৯]

১৯৯ আমি নিজে অনুবাদে দক্ষ নই। অনুবাদ করা অনেক কঠিন মনে হয়। হ্যাঁ, প্রয়োজন পরিমাণ শেখার চেষ্টা করছি। ইলমী বিভ্রাট যেন না হয়, সেটা খেয়াল রাখার চেষ্টা করছি। উদ্দেশ্য হল– মূল বিষয়টি বুঝে নিজের ভাষায় সাবলীলভাবে পেশ করা। বিষয়বস্তু বুঝতে ভুল করা এবং ভাষাগত সুন্দর-অসুন্দরের বিষয়– এ দু'য়ের মাঝে অবশ্যই বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

একাধিক অভিধান দেখুন
কিছু অভিধান আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করুন

উপরের শিরোনামটি কোনো কোনো ভাইয়ের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কারণ, আমরা জানি– অভিধান দেখতে হয় প্রয়োজনের সময়। অভিধান তো অধ্যয়নের জন্য নয়। তারপরও আমার প্রিয় ভাইদের কাছে আবেদন থাকবে, নিম্নের কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন।

প্রয়োজনের সময় মানুষ যখন কিছু তলব করে, তাতে অনেক সময়ই তাড়াহুড়া করা হয়। যার ফলে সুস্থিরভাবে কোনো ফায়সালা করা যায় না। তাই এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে এবং ভুল হয়ও।

প্রয়োজনের সময় দু'চার মাসআলা যারা ঘাঁটাঘাটি করেন, তারা কি বাস্তবে মুফতী? না যারা সর্বদা ফিকহের শুরু-শেষ অধ্যয়ন করেন তারাই প্রকৃত মুফতী? তাহলে এই একই কথা ভাষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করুন।

আপনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে, অবশ্যই খেয়াল করে থাকবেন– একটি কিতাব প্রকৃত অর্থে বুঝতে হলে কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়। পুরো কিতাব পড়লে যে ইতমিনান ও প্রশান্তি অর্জন হয়, কিছু অংশ পড়লে তা কখনো অর্জন হওয়ার নয়।[২০০] কিতাব তো আমরা পড়ি ফন বোঝার জন্য। নফসে কিতাব তো আমাদের মূল মাকছাদ নয়। তাই যদি লুগাতের এই ব্যাপ্ত ও গভীর ফন বুঝতে হয়, তাহলে অবশ্যই কিছু নির্ভরযোগ্য অভিধান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বুঝে বুঝে আয়ত্ব করে করে পড়তে হবে।

'অভিধান' শব্দটি বললেই আমাদের অনেকের অন্তরে ***মিসবাহুল লুগাত***, ***আল-মুনজিদ***, ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত*** ইত্যাদি মোটা মোটা কিছু অভিধানের চিত্র ফুটে

---

২০০ **হযরত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় চমৎকার বলতেন–**

الكتابُ لا يُعطيك سرَّه إلا إذا قرأتَه كلَّه. من مقدمة نجله الشيخ سلمان حفظه الله تعالى لكتابه «صفحات من صبر العلماء».

উঠে। বাস্তবে এসব অভিধান মুতালাআ'র কথা এখানে বলা হয় নি। যদিও ***আল-মুনজিদ***[২০১] আধুনিক আরবী ব্যবহার ও ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত*** কুরআন মাজীদের ব্যবহার বোঝার জন্য খুবই উপকারী। তাই পুরোপুরি না হলেও এসব অভিধান অনেকাংশে ঘেঁটে দেখা দরকার অবশ্যই।

এখানে উদ্দেশ্য হল– প্রথম যুগের ভাষাবিদ ইমাম ও মধ্য যুগের ভাষা-বিশেষজ্ঞ আলিমদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। সেসব অভিধানের অনেকগুলোই সংক্ষিপ্তকারে রচিত। হ্যাঁ, কোনো কোনো অভিধান আছে খুব বড়। তাতে সমস্যার কী আছে? আমার তো আজকে পড়ে শেষ করার কোনো তাগাদা নেই। আমি তো সারাজীবন পড়বো।

উদাহরণস্বরূপ কিছু ছোট ছোট অভিধানের নাম দেখুন–

- ***গরীবুল কুরআন***, আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদী।
- ***গরীবুল কুরআন***, আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন উযাইর।
- ***তাফসীরু গরীবুল মুয়াত্তা***, আবদুল মালিক বিন হাবীব আন্দালুসী।
- ***তাফসীরু হুরূফিল মুখতাসার***, ইমাম আবূ মানছূর আযহারী।
- ***মাক্বায়ীছুল্লুগাহ***, ইমাম ইবনু ফারিস।
- ***মুজমালুল্লুগাহ***, ইমাম ইবনু ফারিস।
- ***মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন***, রাগেব আসফাহানী।
- ***আল-মুগরিব***, আল্লামা মুতাররিযী।
- ***আল-মিসবাহুল মুনীর***, আল্লামা ফাইয়ূমী।

যদিও আরবীভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে এসব বড় বড় অভিধানগুলোও আমাদের চেখে দেখতে হবে শব্দে শব্দে

- **তাহযীবুল লুগাহ**, আযহারী।
- **জুমহুরাতুল লুগাহ**, ইবনে দুরাইদ।

---

২০১ নিকট অতীতের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রাজ্ঞ আলিমে দ্বীন শাইখুল আদব ওয়াল-ফিকহ হযরত মাওলানা ই'যায আলী (মৃত ১৩৭৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,
'যখন ছাত্রদের ***মুফরাদাত*** বোঝার যোগ্যতা হয়, তখন তাদেরকে আহলে লুগাতের কিতাবাদি পাঠের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে ***মুখতারুস সিহাহ*** বা এ ধরনের অন্য কোন কিতাব তাদের মুতালাআয় দিয়ে দেবে। যখন তাদের মাঝে আরবী বোঝার যোগ্যতা হয়ে যায় তখন ***মুন্তাহাল আরব*** এবং ***লিসানুল আরব*** থেকে ইস্তেফাদা করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেবে।
আকরাবুল মাওয়ারিদ অধিক সহজ হওয়া সত্ত্বেও তাতে আমার বহু সংশয় ও প্রশ্ন আছে। ***মুনজিদ***ও আমার কাছে নতুন শব্দ শেখার জন্য এক পর্যায়ে উপকারী। কিন্তু প্রাচীন আরবী বিশেষত কুরআন হাদীস ও তাফসীর বুঝতে তার সহযোগিতা নেওয়া বিষ মেশানো মধু থেকে কম নয়।' হযরাতুল উস্তায মাওলানা মুফতী ইমদাদুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম লিখিত শাহকার গ্রন্থ ***আকাবিরে দেওবন্দের ছাত্রজীবন*** ২/৮১

- **আল-মুহকাম**, ইবনে সাইয়েদাহ আন্দালুসী।
- **আল-ফায়েক**, যামাখশারী।
- **আন-নিহায়াহ**, ইবনুল আছীর জাযারী।
- **লিসানুল 'আরব**, ইবনে মানযূর।
- **'উমদাতুল হুফ্ফায**, সামীন হালাবী।

এবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টিতে প্রবেশ করি– একটি শব্দের জন্য একাধিক অভিধান দেখা।[২০২] মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আরেকটি কথা মনে রাখলে সুবিধা হবে। আরবীভাষায় আমরা অনেক সময়ই দেখতে পাই, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকে। আমাদের কাছে বাহ্যত মনে হয়, এগুলো বিভিন্ন অর্থ। বাস্তবে এগুলো বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন হলেও মূল অর্থ এক-দু'টিই থাকে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেখুন :

আরবীতে قَرْءٌ শব্দটি আমাদের কাছে বিপরীত শব্দ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ একটি। দেখুন ইমাম জাওহারী (মৃত ৩৯৮ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি কী বলেন,

القَرءُ (بالفتح): الحيضُ، والجمعُ: أقراءٌ وقروءٌ، على فُعُولٍ.

والقَرءُ أيضًا: الطهر، وهو من الأضداد. ...

وإنما القرء: الوقتُ[২০৩]، فقد يكون للحيض، وقد يكون للطهر.

'قَرْءٌ (ক্বফের উপর যবর দিয়ে), হায়েয। বহু বচন, أقراءٌ ও قروءٌ (ফুউলুন ওজনে)।

এর আরেকটি অর্থ, পবিত্রতা। এটি বিপরীতমুখী শব্দ। মূলত قَرْءٌ-এর আসল অর্থ হল– সময়। আর সময় তো কখনো হায়যের হয়। কখনো তুহরের হয়।'[২০৪]

---

২০২ এই আলোচনার মূলনীতি হল– মুকারানা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

২০৩ উল্লেখিত নসের সিয়াক থেকে কেউ সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারেন– وقتٌ শব্দটি এখানে পূর্ণ মুতলাক নয়। বরং উদ্দেশ্য, হায়য ও তুহরের মাঝে জামে' ওয়াক্ত। বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। হায়য ও তুহর ছাড়াও قرء শব্দটি মুতলাক সময়ের অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। *লিসানুল 'আরব* দেখতে পারেন।

২০৪ *আস-সিহাহ* পৃ. ৯২৪, আরো দেখুন *ইয়াকুতাতুস সিরাত* পৃ. ১৮০ (সূরা বাকারার অংশে)। আরেকটি কথা মনে রাখা যায়– কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, শব্দটি মূলত তুহর থেকে হায়েযে, অথবা হায়েয থেকে তুহরে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে। দেখুন, *মুফরাদাত* ৩৯৯ ও *আত-তাহরীর* ২/৩৯০

এবার একাধিক অভিধান দেখার গুরুত্বের ব্যাপারে দু'টি কথা শুনুন। উপরে আমরা দেখেছি– জাওহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, قَرْءٌ শব্দটি ক্বফের উপর যবর দিয়ে হবে। অথচ আমাদের মহলে শব্দটি قُرْءٌ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কেউ যদি শুধু ***আস-সিহাহ*** মুরাজা'আত করেই ক্ষ্যান্ত থাকে, সে বলবে, জাওহারীর মত এত বড় একজন ইমাম বলেছেন, শব্দটি ফাতহা দিয়ে। সুতরাং যম্মার উচ্চারণ ভুল!!

কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। তিনি শুধু একটি হরকত নকল করেছেন। ভিন্নটা ভুল– এমনটি তিনি বলেন নি। এ জন্য আমরা যদি অন্যান্য অভিধান মুরাজা'আত করি, দেখতে পাবো, অন্যান্য ভাষাবিদ ইমামগণ যম্মার উচ্চারণও লিখেছেন।[২০৫]

যারা একটি শব্দ ***আস-সিহাহ*** অভিধানে দেখার পর ***লিসানুল 'আরব***-এ দেখেছেন, তারা জানেন– ইবনে মানযূর রহমাতুল্লাহি আলাইহি জাওহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রায় পুরো কথাই নিয়ে আসেন। কখনো আবার জাওহারীর কথার উপর কিছু কথা বৃদ্ধি করেন। কোথাও ভুল মনে হলে সেগুলো ঠিক করেন। যেমনটা তিনি ভূমিকাতে সুস্পষ্টই বলেছেন। তিনি এই শব্দটি ***আস-সিহাহ*** থেকে নকল করা সত্ত্বেও উভয় উচ্চারণই একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[২০৬]

কেউ যদি উপরোক্ত শব্দটির তাহকীকের জন্য শুধু ইয়াযীদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর **গরীবুল কুরআন ওয়া-তাফসীরুহু** গ্রন্থ মুরাজা'আত করে, তাহলে সে কখনো বুঝতে পারবে না, শব্দটির মূল অর্থ কী? অথচ এটা কুরআনুল কারীমের অর্থ লেখার জন্যই রচিত। বাস্তবতা হল– কখনো কখনো দু'চার কিতাবেও একটি বিষয়ের পুরো আলোচনা পাওয়া যায় না। তাহলে এক কিতাবে কিভাবে সম্ভব?

এবার আরেকটি উদাহরণ দেখুন :

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا﴾

জানার বিষয় হল– উক্ত আয়াতে اُمِّهَا শব্দটির অর্থ কী? আপনি যদি ***মুফরাদাত*** মুরাজা'আত করেন, অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন না। কারণ, তিনি এ আয়াতে ব্যবহৃত অর্থ উল্লেখ করেন নি। যদি আবূ ওমর যাহেদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***ইয়াকুতাতুস সিরাত*** গ্রন্থে দেখেন তাও অর্থ পাবেন না। যদি ইয়াযীদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ***গরীবুল কুরআন***-এ খোঁজ করেন, দেখতে পাবেন, তিনি বলছেন,

---

২০৫ ***আল-মুগরিব*** ২/১৬৪, ***আল-মিছবাহুল মুনীর*** পৃ. ৩১৩, ***আল-কামুসুল মুহীত*** পৃ. ১২৯৮

২০৬ ***লিসানুল 'আরব*** ১/৯২

يعني: أمّ القرى، وهي مكة.

আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাই যদি লক্ষ্য করেন থাকেন, তাহলে একটা প্রশ্ন জাগবে– আয়াতটি থেকে বোঝা যায়, এটি আল্লাহর অমোঘ বিধান। আয়াতটির উপস্থিত মেসদাক অবশ্যই মক্কা হতে পারে। কিন্তু আয়াতটির ব্যাপক একটি থাকাটাও নিশ্চিত।

এবার দেখুন হাফেয আবুল ফিদা ইবনু কাসীর (মৃত ৭৭৪ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি কী বলেন,

وقيل: المراد بقوله ﴿حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا﴾ أي: أصلها وعظيمتها، كأمهات الرساتيق والأقاليم. حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما رحمهم الله تعالى، وليس ببعيدٍ.

‘বলা হয়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল– বিরাট ও কেন্দ্রীয় শহর। কথাটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা যামাখশারী, ইবনুল জাওযী ও অন্যান্যরা। এটাও সঠিক হতে পারে। অস্বাভাবিক নয়।’[২০৭]

---

২০৭ *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম* ৩/৪৮৪, আরো দেখা যেতে পারে– *মা‘আনিল কুরআন*, আবূ জা‘ফর আন-নাহ্হাস ২/৯০০, *ইরশাদুল আকলিস সালীম* ৫/১৩৭, *আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর* ২০/১৫২

এ অর্থটি উদ্ধার করার জন্য আরো দেখা যেতে পারে– *আস-সিহাহ* ৫৪, *আল-কামূছুল মুহীত* ৭৩ ও *লিসানুল আরব* ৬/৫৪৯, ৫৫০ ও ৫৫১। তিনি তো আয়াতটিও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আপনি আয়াতসহ এমন অনেক শব্দ এই বিশাল অভিধানটিতে পাবেন, যেটা আপনি *মুফরাদাত*-এও পাবেন না! এমনকি ফিকহের কিতাবের অভিধান *আল-মিছবাহুল মুনীর*-এও আপনি এ অর্থ পেয়ে যাবেন। তাই প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অভিধানে শব্দ খোঁজা দরকার।

কেউ যদি শামের কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায়, তার জন্য *তারীখু বাগদাদ* দেখাও কর্তব্য। তেমনি কেউ যদি শাফে‘য়ী মাযহাবের ফাইরোযআবাদী (*আল-কামূছ*-এর লেখক) সম্পর্কে জানতে চায়, তিনি আল্লামা মাহমূদ বিন সুলাইমান কাফাবী (মৃত ৯৯০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *কাতাইবু আ‘লামিল আখইয়ার মিন ফুকাহাই মাযহাবিন নু‘মানিল মুখতার* গ্রন্থও খুলে দেখবেন। খুলে দেখুন, তিনি ফাইরোযআবাদীর কত সুন্দর জীবনী লিখেছেন। তাঁর উল্লেখিত অভিধান সম্পর্কে কতটা মূল্যবান মন্তব্য করেছেন।

আমার প্রিয় তালিবে ইলম ভাই, আপনিই বলুন, যিনি এসব জীবনীগ্রন্থগুলো শুধু প্রয়োজনের সময় মুরাজা‘আত করবেন, তিনি কিভাবে ফাইরোযআবাদীর জীবনী হানাফী ফকীহদের জীবনীগ্রন্থে পাবেন? কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার গুরুত্ব দলিল দিয়ে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত ইমামুল আছর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অভিজ্ঞতার কারণেই বলেছিলেন– যে ব্যক্তি মাযহাবের মাবসূত কোনো গ্রন্থ (উদাহরণস্বরূপ, *আল-বাহরুর রায়েক*, বা *রদ্দুল মুহতার*) শুরু-শেষ অধ্যয়ন না করবে, তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই!

কেন এ কথা বলেছিলেন?! যে কোনো ফনের আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন না করলে যেমন অনেক সহজ-সহজ বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি একই ফনের একই মাসআলা একাধিক স্থানে আলোচিত হওয়ায় কখনো কোথাও মুতলাক উল্লেখ করা হয়, আবার কোথাও মুকায়য়াদ। শুধু মুতলাকের দিকে লক্ষ্য করে সকল রক্তকে নাপাক বলা কি জায়েয? এসব মাবসূত গ্রন্থাবলি শুরু-শেষ অধ্যয়ন না করেও সাধারণ মানুষের মাঝে 'মুফতী' ও 'মুহাদ্দিস' লকব লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তির জন্য ফতোয়া দেয়া, হাদীসের ব্যাপারে মুখ খোলা কোনোটাই জায়েয নেই।

আপনি যদি শুরু-শেষ অধ্যয়ন না করেন, খুঁজে পাবেন– কোথায় হাফেয জামালুদ্দীন যাইলা'ঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাকেম ছাহেবের তাসাহুলের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন? কোন কোন রাবীর ব্যাপারে হাফেয ইবনুল জাওযী স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন? কোন কোন কারণে হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী তাঁর *মীযানুল ই'তিদাল* গ্রন্থে পূর্ববর্তী নাকিদীনের উপর ইশকাল করেছেন? কোথায় কোথায় হযরত বানূরী মুবারকপূরীর উপর ইশকাল করেছেন? একই হাদীস ইমাম বুখারী ও অন্যান্য ইমামগণ কেন বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেন? এক সনদে বর্ণনা করেন, না বিভিন্ন সনদে? শুরু-শেষ অধ্যয়ন না করলে কিভাবে বুঝবেন একজন লেখকের কিতাবের কোন অংশটুকু বেশি সুন্দর ও মুতকান? কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো আপনি কি বলতে পারবেন– 'আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর '*উমদাতুল ক্বারী*র শুরুর দিকের নযীর মেলা ভার? আরও কত কিছু!

নোট করুন

অধ্যয়নকে কার্যকারী ও অধিক ফলদায়ক করার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল– নোট করা। নোট বিশেষ কোনো পকেট-খাতা বা ডায়রিতে হতে পারে। কিংবা বিশেষ আদব ও নীতি রক্ষা করে কিতাবের গায়েও হতে পারে।

নোট করার বিষয় তো অনেক। প্রত্যেকেই নিজস্ব রুচি অনুযায়ী নোট করবে। প্রথমে আনাড়ীর মতো হলেও নোট করতে থাকা উচিত। সহজার্থে নিম্নে কিছু নমুনা দেখানো হল :

- অপ্রাসঙ্গিকভাবে লেখক যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফাওয়ায়েদ উল্লেখ করেছেন সেগুলো নোট করে রাখুন। আপনি শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর *মাবাদিউ ই'লমিল হাদীস* গ্রন্থটি মুতালাআ' করার সময় দেখুন, তিনি বেশ কিছু জায়গায় কুরআনের অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা ও ফাওয়ায়েদ উল্লেখ করেছেন(২০৮), যেগুলো বাস্তবে তাফসীরের সচরাচর গ্রন্থাবলিতেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মাত্র এ ৮/১০টি ফাওয়ায়েদ নিয়ে কেউ চিন্তা করলে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে– এই মহান লেখক ফুরসানুল কুরআনের এক অনন্য অভিযাত্রী ছিলেন।(২০৯) ***ফাওয়ায়েদে উসমানী*** ঘাঁটার প্রয়োজন নেই।

- আপনার পঠিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলে তা ঐ কাগজে নোট করে রাখুন। সময়-সুযোগ পেলে তা বারবার দেখতে থাকুন। ভাবতে থাকুন। আপনি যখন ***শারহে বিকায়া*** পড়ছেন, লেখক দু'এক জায়গায় ছাহিবুল ***হিদায়া***-এর কথার উপর ইশকাল করেছেন। সেটা আপনি নোট করে রাখুন। কোন কোন মাসআলায় ইমাম সাহেবের মত ছেড়ে সাহিবাইন বা ইমাম যুফার

---

২০৮ দেখুন *মাবাদিউ ইলমিল হাদীস* পৃ. ৪৪-৪৫, ৮৮, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১৬৬ ও ৩৩৩। এ মূল্যবান গ্রন্থটির নিজস্ব কপি এখনো লেখকের সংগ্রহে নেই। এক প্রিয় তালিবে ইলম মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলামের কপিই পড়ার সময় অনুমতিক্রমে কিতাবের গায়ে এগুলো নোট করা হয়েছিল।

২০৯ এমনিতেই তো লেখক পুরো কিতাবে অতুলনীয় সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন, যার ফলে এ কিতাব বারবার পড়েও হজম করা মুশকিল। আর কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে যেন তিনি নিজের ইমামত সাব্যস্ত করে ছেড়েছেন।

রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মতের উপর ফতোয়া দেয়া হয়েছে? ইমাম বুখারী একটি হাদীস কত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন? সবগুলো এক সঙ্গে করলে বুঝবেন– কোনো কোনো আলিম যে বলেছেন, ইমাম বুখারী হাদীস তাকরার করলে একই সনদে আনেন না, কথাটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সঠিক। দু'এক জায়গায় বিপরীতও হয়েছে।

- যদি আপনার পঠিত গ্রন্থটি শরাহ হয়, তাহলে দেখুন, কত জায়গায় তিনি মূল লেখকের উপর আপত্তি করেছেন। পুরো শরাহ পড়া হলে সবগুলো মিলিয়ে দেখুন– শারেহ কত স্থানে সঠিক আপত্তি করেছেন। আর কত স্থানে লেখকের কথাই সঠিক। আপত্তিগুলো সামনে রাখলে শারেহের ইলমী নাকদের মানহাজও আপনার বুঝে আসবে।

- মানুষ হিসেবে লেখকেরও কিছু ভুল থাকতে পারে। তাই আপনি যখন গ্রন্থটি মুতালা'আ করছেন, তখন তাহকীক ও মুরাজা'আতের পর আপনার কাছে যেসব আলোচনা ভুল মনে হবে, সেগুলো নোট করে রাখতে পারেন।

- গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি তালাশ করছেন, সে ব্যাপারে কোনো তথ্য পেলে তাও নোট করে রাখতে পারেন। সব সময় কিছু বিষয়ে ইসতিকরা করতে থাকুন। আপনি ফিকহের কিতাব ঘেটে ৫০টি মাসআলা বের করে আনুন, যেগুলোতে আমাদের ইমামগণ ইস্তেহসানকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আপনি তো সংক্ষেপে উসূলুল ফিকহের কিতাবে পড়ে এসেছেন– ইস্তেহসান বিল আছার হয়, বিল ইজমা' হয়, বিল তা'আমুল হয়। দু'একটি উদাহরণও হয়ত পড়েছেন। কিন্তু আপনি যখন বিরাট সংখ্যক মাসায়েল নিয়ে ইসতিকরা করবেন, তখন বাস্তবে উসূলিয়্যীন ইমামগণের কথার সঠিকতা বুঝতে পারবেন। এরপরই আপনি এ ক্ষেত্রে মুহাক্কিক ও বিজ্ঞ। এর আগ পর্যন্ত আপনি এ ক্ষেত্রে মুকাল্লিদ ও অনভিজ্ঞ। যে কেউ আপনার উপর ইশকাল করলে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। হৃদয়কে যে জ্ঞান প্রশান্ত করে না সেটা তো হাকীকতে ইলম নয়। একজন সাধারণ মানুষও তো বাংলা কিতাব পড়ে কুরআন-হাদীসের অনেক কিছু বলতে পারে। কিন্তু তাকে কি আলেম বলা যায়?!

- মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এবং উলূমের মুআসসিস ইমামগণের কিতাব যখন অধ্যয়ন করবেন, তখন একটি বিষয় খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে– তিনি কী ফিকির ও ফাহম নিয়ে লিখছেন? কিভাবে তিনি কথাটা বললেন? কুরআন থেকে তিনি এটা কিভাবে বুঝলেন? একটি উদাহরণ পড়ার পর আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি সামনে বাড়বেন না, থেমে যান। একবার ভাবুন। দুইবার ভাবুন। মূলে পৌঁছা পর্যন্ত ভাবতে থাকুন। যদি তাঁদের অতলস্পর্শী

বুঝের কিছুটাও কাছে যেতে পারেন– আপনি সফল ইনশা-আল্লাহ। পড়ার সময় এমন কিছু চিন্তাও নোট করে রাখুন।

- লেখক একটি মাসআলা/ বিষয় বলতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনার যদি এটা বুঝে আসে তাহলে তা সঙ্গে সঙ্গে নোট করে ফেলুন।

- প্রতিটি কিতাবেরই কিছু জায়গা থাকে কঠিন কিংবা খুব কঠিন। সেসব স্থান নির্ণয় করে রাখুন। সেগুলো বারবার দেখে আয়ত্ব করে ফেলুন। কোনো সময় কাউকে যদি কিতাব থেকে পরীক্ষা নিতে হয়, এসব কঠিন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে দেখুন– তিনি সেসব ভালোভাবে বুঝেছেন কি না? নোট করা না থাকলে সেটা প্রায় অসম্ভব।

- মুসান্নিফীনের মারাজি' ও মাসাদির নোট করে রাখুন। মুসান্নিফ স্পষ্ট নাম উল্লেখ করলে তো নোট করা সোজা। স্পষ্ট উল্লেখ না করলে সেটা বড় কঠিন। যারা সাধারণত অনেক মাসাদির সামনে রেখে কাজ করেন তারা প্রচুর মেহনতে করেই কাজ করেন। তাই তাদের মাসাদির যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা এ থেকে অনেক ফায়েদা নিতে পারবো। কখনো তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নামও এর মধ্যে এসে যায়। হাফেয 'আলাউদ্দীন মুগলতাই (মৃত ৭৬২ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছোট্ট একটি রিসালা ***ইসলাহু (কিতাবি) ইবনিস সালাহ***। এ কিতাবে তাঁর মারাজি' সংখ্যা শতাধিক।

- এর মধ্যে যেমন উলূমুল হাদীসের কিতাব আছে, তেমনি আছে লুগাতের ***তাহযীব*** ও ***আল-মুহকাম***। যেমন তারীখ ও রিজালের কিতাব আছে তেমনি আছে তাফসীরের কিতাবও।

এমন অনেক বিষয়ই নোট করতে পারেন। পাঠকের রুচি ভেদে সেসবে পার্থক্যও হতে পারে।

উৎস-গ্রন্থ

القرآن الكريمُ وعلومُه

- القرآنُ الكريْم.
- أحكام القرآن. للإمام أبي بكر ابن العربي المالكيِّ. ط دار ابن الجوزي.
- أحكامُ القرآن. للإمام أبي بكر الجصاص الرازي. تصوير قديمي كتب خانه.
- أحكام القرآن. لابن الفرسِ الأندلسي. ط دار ابن حزم.
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. للمفتي أبي السعود الحنفي. ط المكتبة التوفيقية.
- البرهان في علوم القرآن. للحافظ بدر الدين الزركشي. ط دار ابن الجوزي.
- التبيان في علوم القرآن. للشيخ محمد الصابوني. ط مكتبة البشرى.
- تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة. لابن عاشور. ط دار السلام بمصر.
- التحرير والتنوير من التفسير. لابن عاشور. ط الدار التونسية.
- تفسير الجلالين. للحافظ السيوطي والفقيه المحلي. ط المكتبة الإسلامية.
- تفسير القرآن العظيم. للحافظ ابن كثير. ط دار الحديث.
- تفسير أبي القاسم الكعبي. ط دار الكتب العلمية.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ط دار الحديث.
- الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي. ط دار الحديث.
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للإمام عبد الرحمن الثعالبي المالكي. ط إحياء التراث العربي ببيروت.
- دُرَّةُ التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز. للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الإسكافيّ الخطيب. ط دار المعرفة، بيروت.
- طبقات المفسرين. للحافظ الداودي. ط دار الكتب العلمية.

- الطريق إلى القرآن. (الجزء الثالث). للأستاذ مولانا أبو طاهر المصباح. ط دار القلم.
- فصول في أصول التفسير. لمساعد سليمان الطيار. ط دار النشر الدولي.
- الكشافُ عن حقائق التنزيل وعيون التأويل. للزمخشري. ط دار الحديث.
- المحرَّرُ في علوم القرآن. للدكتور مساعد الطيار. ط وزارة الأوقاف بدولة قطر.
- المحرَّرُ الوجيزُ. للإمام ابن عطية الأندلسي. ط وزارة الأوقاف بقطر، وط دار الكتب العلمية.
- معاني القرآن. للإمام أبي جعفر النحاس. ط دار الحديث.
- معرفة تاريخ العرب: أثرها وأهميتها في فهم التنزيل الحكيم. لراقم الحروف.
- مفاتيح الغيب. للإمام الرازي. ط دار الحديث.
- يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن. للعلامة يوسف البنوري. ط المجلس العلمي مع "مشكلات القرآن"، ومفردًا.
- معارف القرآن۔ حضرت مولانا ادریس کاندہلوی۔
- معارف القرآن۔ مفتی شفیع۔
- علوم القرآن۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی۔
- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী। অনুবাদ মাওলানা আবুল বাশার সাইফুল ইসলাম। মাকতাবাতুল আশরাফ প্রকাশিত।

الحديثُ الشريفُ وعلومُه

- أربع رسائل في مصطلح الحديث. جمع وتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. ط مكتب المطبوعات الإسلامية.
- إجماع المُحدِّثين. للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني. ط دار عالَم الفوائد.
- الإمام ابن ماجه وكتابه السنن. للشيخ عبد الرشيد النعماني. مصورةٌ من ط مكتب المطبوعات الإسلامية.
- الإمام الحبر البحر أبو نعيم الأصفهاني وموقفه من الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمهما الله تعالى ورضي عنهما. لراقم الحروف.

- التحقيق. لابن الجوزي. ط دار الكتب العلمية.
- التصريح بما تواتَر من نزول المسيح. لإمام العصر أنور شاه الكشميريّ (تحقيق الشيخ عبد الفتاح) ط دار السلام.
- التعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاري في الجامع الصحيح. للحافظ أبي الوليد الباجي المالكيّ. ط دار الكتب العلمية.
- التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة. للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط مكتب المطبوعات الإسلامية.
- تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر. ط دار اليسر.
- تكملة فتح الملهم. لشيخ الإسلام المفتي القاضي محمد تقي العثماني. ط مكتبة معارف القرآن.
- تنقيح التحقيق. لابن عبد الهادي الحنبلي. ط دار الكتب العلمية.
- تهذيب التهذيب. للحافظ ابن حجر. ط دار الحديث.
- توجيه النظر إلى أصول الأثر. لطاهر الجزائري. ط دار السلام.
- الجامع. للإمام الترمذي. ط مكتبة الفتح. داكا.
- الحديث المعلول قواعد وضوابط. للدكتور حمزة المليباري. ط دار ابن حزم.
- خمس رسائل في مصطلح الحديث. جمع وتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ط مكتب المطبوعات.
- دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية. للشيخ عبد المجيد التركماني. ط دار ابن كثير.
- زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث. للدكتور حمزة بن عبد الله المليباري. ط دار ابن حزم.
- السنن. لابن ماجه. ط المكتبة الإسلامية.
- السنن. لأبي داود. ط المكتبة الإسلامية.
- شرح صحيح مسلم. للإمام النووي. الطبعة الهندية.
- شرح علل الترمذي. للحافظ ابن رجب الحنبلي. ط دار السلام.

- شرح نخبة الفكر (المسمى بـ«نزهة النظر»). للإمام الحافظ ابن حجر.
- شرح موقظة الذهبي. للشيخ الشريف حاتم. ط ابن الجوزي.
- الصحيح. لابن خزيمة. ط المكتب الإسلامي.
- علل الترمذي الكبير. مطبوع مع الجامع.
- علوم الحديث. لابن الصلاح. ط دار الحديث.
- الطبقات الكبرى. لابن سعد. تصوير المكتبة العمرية.
- ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني. للعلامة عبد الحي اللكنوي. ط دار السلام بمصر.
- فيض الباري. لإمام العصر الكشميري. تصوير المكتبة الأشرفية من مطبوع دار الكتب العلمية ببيروت.
- ما لا يسع المحدث جهلُه. للميانشي (ضمن "خمس رسائل" جمع الشيخ عبد الفتاح). ط مكتب المطبوعات.
- مبادئ علم الحديث وأصوله. لشيخ الإسلام شبير أحمد العثماني. ط مكتب المطبوعات الإسلامية.
- المجتبى. للإمام النسائي. ط المكتبة المتحدة. وط مؤسسة الرسالة.
- المدخل إلى علوم الحديث الشريف. للشيخ عبد المالك. ط المركز.
- المسند. لأبي داود الطيالسي. ط دار القدس.
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للإمام مسلم. ط مكتبة الفتح.
- المدخل. للحاكم أبي عبد الله النيسابوري.
- الموقظة. للحافظ الذهبي. ط مكتب المطبوعات.
- المقالات. للعلامة الكوثري. تصوير أيج أيم سعيد كمبني، باكستان.
- مهمات من أصول الجرح. لراقم الحروف.
- نصب الراية. للحافظ الزيلعي. ط دار القبلة.
- نظرات جديدة في علوم الحديث. للدكتور حمزة عبد الله. ط دار ابن حزم.